সম্রাট
সলোমনের
গুপ্তধন
নির্মল চৌধুরী

সম্রাট সলোমনের গুপ্তধন

(দক্ষিণ আফ্রিকার দুঃসাহসিক কাহিনী)
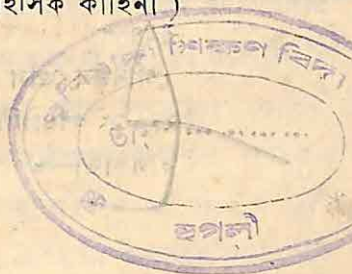
মূললেখক—স্যার এইচ, রাইডার হ্যাগার্ড

সংক্ষিপ্ত অনুবাদ—নির্মল চৌধুরী

ঘোষ ব্রাদার্স এণ্ড কোং
৭ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট
কলিকাতা—৬

প্রকাশক—
শ্রীভবেশ চন্দ্র ঘোষ
৭ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট
কলিকাতা—৬

মুদ্রণ—
গোবর্দ্ধন প্রেস
২০৯ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট
কলিকাতা—৬

প্রচ্ছদপট পরিকল্পনা—
প্রচারিকা
১৬।১৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট
কলিকাতা—১২

পরিবেশক -
ক্যালকাটা বুক এজেন্সি
৭ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট
কলিকাতা—৬

আড়াই টাকা
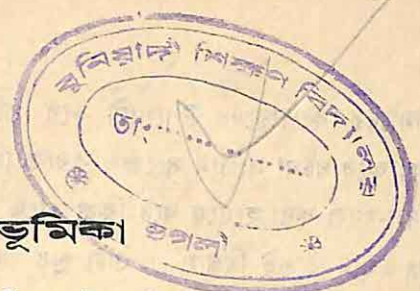
ভূমিকা

রহস্যময় আফ্রিকার পটভূমিকায় ইংরাজী সাহিত্যে যে সব উপন্যাস লেখা হয়েছে, তারমধ্যে স্যার হেনরী রাইডার হ্যাগার্ডের কিং **সলোমন'স মাইন** জনপ্রিয়তায় একটি স্থায়ী আসন লাভ করেছে। কাহিনী গ্রন্থনে, ভয় সঙ্কুল ঘটনা প্রবাহে, উত্তেজনার উত্তাল বিক্ষোভে, পাঠকের সন্দেহ-সংশয়াকুল মনের রাশ তিনি এমনভাবে টেনে রাখেন যে, তাঁর বই ছেড়ে ওঠা অতি চঞ্চল মনের পক্ষেও একরকম অসম্ভবই বলা যেতে পারে। প্রত্যক্ষদর্শীর অভিজ্ঞতায় তাঁর রচনা সম্ভার পূর্ণ হয়ে উঠেছে বলে তাঁর কাহিনী হয়েছে গল্পের চেয়েও অদ্ভুত রকমের হৃদয়হারী।

স্যার হেনরীর কাহিনীর আর এক বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, তাঁর কাহিনী এক বিশেষ ধরণের ও বিশেষ সীমানার মধ্যে রচিত হয়েও তা ভৌগোলিক সত্তা অতিক্রম করে বৈচিত্র্য মাধুর্যে সর্বসাধারণের হয়ে উঠেছে। তাঁর কাহিনীর মধ্যে অজানা আফ্রিকা যেন আর নাজানা থাকে না। তার সমস্ত কিছু একটা বিশিষ্ট রূপ ধরে চোখের সামনে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। তার শ্বাপদ-সঙ্কুল অরণ্যানী, দিগন্ত বিস্তৃত জ্বালাময়ী মরুভূমী, গগনচুম্বী হিমশীর্ষ পর্বতমালা আর তার দেশের মানুষের অদ্ভুত ঘরকন্না সব মনের পটে এমন এক অনুভূতিময় ছবি এঁকে দিয়ে যায় যে, তার রং মুছে গেলেও দাগ মোছে না।

ক্রমান্বয়ে প্রায় তিন পুরুষ ধরে যে বইখানি অসামান্য খ্যাতি লাভ করেছে, যা একই সাথে চিরকালের ছেলে বুড়োর মন হরণ করে এসেছে স্যার হেনরীর সেই এ্যাড্‌ভেঞ্চারমূলক উপন্যাসের সংক্ষেপিত অনুবাদ,

আমাদের কিশোরদের উপযোগী করে পরিবেশন করলাম। পারম্পর্য রক্ষা করে ঘটনা সংস্থান সংক্ষেপ করতে গিয়ে কোথাও কোথাও কিছু অদল-বদল করা হয়েছে বটে কিন্তু তাতে মূল কাহিনীর রস কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয়নি বলেই বিশ্বাস। এটা শুধু আমার কথাই নয়, পাণ্ডুলিপির আকারে যাঁরা অনুবাদটি ধৈর্য ধরে শুনেছেন তাঁদেরও। যাঁদের অকৃত্তিম সহযোগিতায় আমাদের কিশোরেরা কিং **সলোমন'স মাইন** এর মতন একখানি শ্রেষ্ঠ এ্যাড্‌ভেঞ্চারমূলক উপন্যাসের আনন্দ উপলব্ধি করার সুযোগ পেলো, কিশোরদের পক্ষ থেকে তাঁদের জন্য রইলো আমার আন্তরিক ধন্যবাদ আর কৃতজ্ঞতা।

নির্মল চৌধুরী

১লা জানুয়ারী,
১৯৫৪, কলিকাতা।

7242

সম্রাট সলোমনের গুপ্তধন

স্যার হেনরী কার্টিস

কেপটাউন। সিন্ধুর কোলে দক্ষিণ আফ্রিকার শেষ এক বিন্দু। তারপরই দুই সাগরের কোলাকুলি। দুই সাগরের নীল জল হাসতে হাসতে এ ওর গায়ে ঢলে পড়ে। বন্ধুত্বের আতিশয্যে ঢেউগুলো ফুলে ওঠে মাথায় মণিওয়ালা অজগরের মত। গর্জাতে থাকে হাজারো তুফানের মত। তার ওপর যদি ঝড় ওঠে, তাহলে আর কথাই নেই—সে কি তাদের মাতামাতি! সমস্ত সৃষ্টিটা যেন ঢেউয়েরা আঙ্গুল দিয়ে পাকে পাকে জড়িয়ে পিষে মেরে ফেলতে চায়। 'ডান্‌কেল্‌ড' জাহাজের যাত্রা পথে সেদিন প্রায় এমনিতর এক বিপর্যয় ঘনিয়ে এলো।

'কেপ' থেকে জাহাজখানা 'ভোঁ' দিয়ে বার-দরিয়ার দিকে মুখ বাড়িয়ে খানিক যেতে না যেতেই কালো হয়ে সন্ধ্যে ঘনিয়ে এলো। কিন্তু তার চেয়েও কালো হয়ে উঠলো মহাসাগরের নীল জল। সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিলো এক বিশ্রী আবহাওয়া। সুদূর তটরেখা থেকে উঠলো একটা তীব্র বাতাস। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টির মতন একধরণের

প্রবল কুয়াশা সবাইকে ডেক থেকে তাড়িয়ে নিয়ে গেলো নিচে। হাল্কা ধরণের ছোট 'ডান্‌কেল্‌ড' জাহাজখানা ঢেউয়ের মাথায় দুলতে আরম্ভ করলো মোচার খোলার মতন। যাত্রীদের প্রতি মুহূর্তে মনে হতে লাগলো, এই বুঝি জাহাজ উল্টে যায়। কিন্তু আশ্চর্য! চরম বিপর্যয় ঘটলো না কোন বারই। জাহাজের কাজকর্মও চলতে লাগলো ঠিক ভাবেই। টং টং করে খাবার ঘরে ঘণ্টা বাজলো। যাত্রীরাও সবাই খাবার ঘরে গিয়ে ঢুকলো। আমিও গিয়ে একটা আসন গ্রহণ করলাম। আমার সামনে একজন সুন্দর চেহারার শক্তিশালী পুরুষকে দেখে আমি বেশ মুগ্ধ হয়ে পড়লাম। ভদ্রলোকের আজানুলম্বিত বাহু, বিরাট ছাতি, হল্‌দে দাড়ি, কাটা-কাটা নাক-মুখ, বড়-বড় উজ্বল চোখ, সবই মনে একটা সম্ভ্রমের ভাব জাগিয়ে তোলে। তাঁর নাম যে, স্যার হেনরী কার্টিস, সেটা যাত্রীর তালিকা ঘেঁটে আমি আগেই আবিষ্কার করে ফেলেছিলাম।

তাঁর পাশে বসেছিলেন, গোফঁদাড়ি কামানো, বেঁটে আর বলিষ্ঠ ধরণের আর একটি ভদ্রলোক। ডান চোখে সূতো বিহীন চশমা, পোষাক-আসাকে একেবারে ফিট্‌ফাট্—কোথাও খুঁত নেই। আলাপ হবার পর জেনেছিলাম যে, ভদ্রলোক আগে নৌ-বাহিনীর একজন ক্যাপ্‌টেন ছিলেন।

যা হোক, খেতে খেতে এদের সঙ্গে বেশ আলাপ জমে উঠলো। ক্যাপ্‌টেনের সঙ্গে শিকারের গল্পে একেবারে মশগুল হয়ে পড়লাম। আর আড্ডা একবার জমলে যা হয় আর কি, আমাদেরও তাই হয়ে দাঁড়ালো। এ কথা থেকে সেকথা, সেকথা থেকে আর এক কথা, এমনি করে হাতী শিকারের কথা উঠলো।

আমার পাশে বসা এক ভদ্রলোক বলে উঠলেন, "ক্যাপ্‌টেন গুড্,

আপনি ঠিক লোককেই পাকড়েছেন মশায়। হাতীর সম্বন্ধে যদি কারুর কিছু বলার অধিকার থাকে, তো তা আছে এই শিকারী কোয়াটার মেইনের। ইনি নিশ্চয়ই সব কথা আপনাকে শোনাতে পারবেন।”

স্যার হেনরী এতক্ষণ নিশ্চল হয়ে বসে নিশ্চিন্ত মনে আমাদের কথাবার্তা শুনছিলেন, কথাটা শুনে একেবারে চম্‌কে উঠলেন।

“মাফ করবেন স্যার”, টেবিলের ওপর একটু ঝুঁকে নিচু অথচ ভারী গলায় জিগ্‌গেস করলেন, “আপনার নাম কি এ্যালান কোয়াটার মেইন ?”

উত্তরে স্বীকারোক্তি জানালাম।

ভদ্রলোক আর কোন দ্বিরুক্তি করলেন না। কিন্তু খেতে খেতে তাঁকে বিড়বিড় করে বলতে শুনতে পেলাম, “কপাল ভালো।”

কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের খাওয়া শেষ হয়ে গেলো। ঘর ছেড়ে বেরুচ্ছি, এমন সময় স্যার হেনরী এসে তাঁর কেবিনে ধূমপানের নিমন্ত্রণ করলেন। নিমন্ত্রণ গ্রহণ করাতে তিনি আমাকে পথ দেখিয়ে ডেক-কেবিনে নিয়ে গেলেন। কেবিনটা ছিলো বেশ ভালোই।

কেবিনের মধ্যে একটা সোফা আর তার সামনে একটা ছোট টেবিল দেখতে পেলাম। স্যার হেন্‌রী উপস্থিত কর্মচারীটিকে কিছু পানীয় আনতে হুকুম করলেন। আমরা তিন জনে পাইপ জ্বালিয়ে সেখানে বসলাম।

জাহাজের লোকটি পানীয় এনে আলো জ্বালিয়ে দিয়ে গেলো। স্যার হেনরী কার্টিস সুরু করলেন, “দেখুন মিঃ কোয়াটার মেইন, আমার বিশ্বাস গত বছরের আগের বছর এই সময়টা আপনি ট্রান্সভ্যালের উত্তরে, বামন-গোয়াতো বলে একটা জায়গায় ছিলেন, না ?”

যতদূর স্মরণ হয় আমার সম্বন্ধে তখন সাধারণের মধ্যে কোনও কৌতূহলই ছিল না, কাজেই ভদ্রলোককে আমার বিষয় এতটা খোঁজ-খবর রাখতে দেখে একটু আশ্চর্য হয়েই উত্তর করলাম, "হ্যাঁ, ছিলাম।"

ক্যাপটেন গুড. তাঁর স্বভাব সিদ্ধ দ্রুত ভঙ্গিমায় জিজ্ঞাসা করে বসলেন, "আপনি সেখানে ব্যবসা করছিলেন ? কেমন কি না ?"

"হুঁ, মানে এই এক গাড়ী জিনিষ নিয়ে আমি উপনিবেশের বাইরে একটা ক্যাম্প করেছিলাম। জিনিষগুলো বিক্রী না হওয়ায় সেখানেই আমাকে থাকতে হয়েছিল।

স্যার হেনরী ঠিক আমার সামনেই একটা চেয়ারে বসে ছিলেন। তাঁর সমস্ত হাতদু'টি টেবিলের ওপর ঝুঁকে ছিলো। তিনি মুখ তুলে তাঁর ধূসর রংয়ের চোখ দুটি সোজা আমার মুখের ওপর ফেললেন। আমার মনে হলো তাঁর চোখের মধ্যে যেন একটা অদ্ভুত কৌতূহল রয়েছে।

"আপনি কি সেখানে 'নেভিলে' ব'লে কাউকে দেখেছিলেন ?"

"হুঁ হুঁ, তিনি দেশের আরো ভেতরে ঢোকার আগে আমার পাশাপাশি প্রায় দিন পনেরো বিশ্রামও করেছিলেন। এর কিছুদিন পরে অবিশ্যি আমি এক উকিলের কাছ থেকে এই মর্মে চিঠি পাই যে, তাঁর কি হয়েছে সে সম্বন্ধে আমি কিছু জানি কি না—লিখে জানাতে। এর জবাবে সে সময় তাঁর বিষয়ে আমার যদ্দূর জানাছিল তদ্দূর জানিয়েও ছিলাম।"

"হ্যাঁ, আপনার চিঠি আমার কাছেই পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল," স্যার হেনরী জবাব দিলেন।

এরপর একটা সাময়িক স্তব্ধতা দেখা দিলো।

হঠাৎ স্যার হেনরী বলে উঠলেন, "মিঃ কোয়াটার মেইন, আমার মনে হয়, আপনি বোধ হয়, আমার—মানে মিঃ নেভিলের উত্তর দিকে যাবার কারণ বা কোন পথে তিনি ঠিক যাত্রা করেছিলেন, সে সম্বন্ধে আপনি কিছু জানেন না বা ধারণাও করতে পারেন না।"

"কিছুটা শুনেছিলাম," বলেই আমি থামলাম। কারণ বিষয়টা নিয়ে বিশদ আলোচনা করতে আর আমার সাহস হচ্ছিল না।

স্যার হেনরী আর ক্যাপটেন গুড্ পরস্পরের দিকে তাকালেন, ক্যাপটেন গুড্ মাথা হেলিয়ে ইশারা করলেন।

আগের ভদ্রলোকটিই বল্‌লেন, "মিঃ কোয়াটার মেইন, আমি আপনাকে এক কাহিনী শোনাতে চাই। এতে আপনার উপদেশ আর হয়তো সাহায্যও চাইতে পারি। যে ভদ্রলোকটি আপনার চিঠিটি আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, তিনি আমাকে এর ওপর পূর্ণ আস্থা রাখতেই বলেছিলেন। কারণ, শুনেছিলাম নাতালে আপনার বেশ নাম ডাকই ছিল আর সবাই আপনাকে সম্মানও করতো—বিশেষ করে বুদ্ধি-বিচারের জন্য আপনার বেশ খ্যাতিই ছিল সেখানে।"

সাধারণ ভদ্র মানুষ আমি, মনের সলজ্জ ভাব লুকোবার জন্য তাই মাথা নিচু করে একটু জল আর পানীয় খেলাম। স্যার হেনরী বলে চল্‌লেন।

"মিঃ নেভিলে আমার ভাই।"

"ওঃ"! বলে আমি চমকে উঠলাম।

"সে ছিল আমার একমাত্র ছোট ভাই," স্যার হেনরী বলতে লাগলেন, "এই পাঁচ বছর আগেও আমরা পরস্পরের কাছে থেকে একটি মাসও ছাড়াছাড়ি হয়ে থাকিনি। কিন্তু ঠিক পাঁচ বছর আগেই একটা অঘটন ঘটে গেল; যেমন সব পরিবারেই ঘটে থাকে আরকি!

আমাদের মধ্যেও হলো ভীষণ ঝগড়া, রাগের মাথায় তখন আমি আমার ভায়ের ওপর অত্যন্ত অন্যায়ই করেছিলাম।" এই কথায় ক্যাপ্‌টেন গুড্ নিজে নিজেই খুব মাথা ঝাঁকাতে লাগলেন। ঠিক সেই সময় জাহাজটাও একটা বড় রকমের টাল খেলো। সামনে আটকানো আয়নাটা মুহূর্তের জন্য আমাদের মাথার ওপর পড়ো-পড়ো হলো। পকেটে হাত পুরে ওপর দিকে তাকিয়ে বসেছিলাম বলেই দেখতে পেলাম যে, ক্যাপটেন গুড্ তখনও এলোপাথাড়ি মাথা ঝাঁকিয়ে চলেছেন।

স্যার হেনরী বলতে লাগলেন, "আপনি জানেন যে, বিলেতে যাদের জমি ছাড়া অন্য কোন সম্পত্তি নেই, তারা যদি উইল করার আগেই মারা যায়, তাহলে সম্পত্তির সবকিছু বড় ছেলেই পায়; আর ঘটনা চক্রে এমনিই হয়েছিলো। আমরা যখন ঝগড়া করি, তখন আমাদের বাবা উইল না করেই মারা যান। উইল করবো করবো করেই তাঁর অনেক দেরী হয়ে যায়। ফলে হলো কি আমার ভাই, যার তখন নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারার মত কোন শিক্ষা-দীক্ষাই ছিল না, একেবারে নিঃস্ব হয়ে পড়লো। সে সময় অবিশ্যি তাকে দেখা আমার উচিত ছিলো কিন্তু আমাদের মধ্যে ঝগড়া তখন এমন তীব্র হয়ে উঠেছিল যে বলতে লজ্জা হয়, আমি তার জন্যে কিছুই করিনি।" এই বলে তিনি একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। "এর মানে নয় যে আমি তাকে হিংসা করতাম। তবে আমি চাইছিলাম সে-ই এগিয়ে আসুক কিন্তু সে আসেনি। এ সব কথা বলে, মিঃ কোয়াটার মেইন আপনাকে খুবই বিরক্ত করলাম, কিন্তু সব বিষয় পরিষ্কার হওয়ার জন্য আপনাকে আমার এ সব বলা উচিত।"

"ঠিক ঠিক", ক্যাপ্‌টেন বলে উঠলেন, "মিঃ কোয়াটার মেইন নিশ্চয়ই এ ইতিহাস গোপনেই রাখবেন।"

আমি বলে উঠলাম, "নিশ্চয়ই, কারণ আমার বুদ্ধি বিবেচনার সম্বন্ধে আমি একটু গৌরব বোধ করে থাকি।"

"তারপর জানেন", স্যার হেনরী বলতে লাগলেন, "সেই সময় আমার ভায়ের ব্যাঙ্কে নিজস্ব নামে কয়েক'শ পাউণ্ড ছিল। আমাকে কিছু না বলেই সে, সেই সামান্য টাকা তুলে, 'নেভিলে' ছদ্মনাম নিয়ে বরাত ফেরাবার আশায় দক্ষিণ আফ্রিকার দিকে পাড়ি জমায়—এটা অবিশ্যি আমি পরে জানতে পারি। তিন বছর এইভাবে কেটে গেলো, কতো চিঠি লিখলুম, কিন্তু ভায়ার আমার কোন খোঁজই পেলাম না। যতো দিন যেতে লাগলো, ওর সম্বন্ধে আমি ততোই চিন্তিত হয়ে উঠতে লাগলাম। মিঃ কোয়াটার মেইন, আমি বুঝতে পারলাম যে রক্তের টান বড় জবর টান।"

আমার ছেলে, হ্যারির কথা মনে ক'রে আমি উত্তর করলাম, "সত্যি কথাই।"

"মিঃ কোয়াটার মেইন, মনে হতে লাগলো আমার একমাত্র আত্মীয় ভাই জর্জ নিরাপদে সুস্থ আছে, তার সঙ্গে আমার আবার দেখা হবে, অন্ততঃপক্ষে এই খবরটাও যদি পাই তাহলে আমি আমার অর্দ্ধেক সম্পত্তিও দিয়ে দিতে প্রস্তুত আছি।"

"বুঝলেন মিঃ কোয়াটার মেইন, যতো দিন যেতে লাগলো ততোই আমার ভায়ের জীবিত কি মৃত যে কোন একটা খবরের জন্যে ক্রমেই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়তে লাগলাম। যদি বেঁচে থাকে তবে তাকে বাড়ী ফিরিয়ে আনতে হবেই এই হলো আমার মনের অবস্থা। লোক মারফৎ আমি খোঁজ নেবার চেষ্টা করলুম, ফলে আপনার চিঠি এলো আমার হাতে। এ পর্যন্ত ভালোয় ভালোয় কাটলো, কারণ জানলাম যে জর্জ তখনও বেঁচে আছে। কিন্তু এতে শেষরক্ষা হলো না, তাই

নিজেই বেরিয়ে পড়লাম তার খোঁজে। ক্যাপটেন গুড্ অনুগ্রহ করে হলেন আমার সাথী।"

"হাঁ কতকটা তাই," ক্যাপ্টেন বললেন, "আধা মাইনেতে উপোস করার জন্য নৌ-বিভাগের বড় কর্তারা আমাকে বিদায় দেবার পর আরতো আমার কাজকর্ম নেই কাজেই—সে যাহোক, আপনি সেই নেভিলে নামে ভদ্রলোকটির কথা যা জানেন বা যা শুনেছেন, এখন হয়তো আমাদের শোনাবেন।"

গুপ্তধনের খবর

ক্যাপ্টেন গুডের প্রশ্নের জবাব দেবার আগে পাইপটাতে তামাক ভরে নেবার জন্যে আমি একটু চুপ করতেই স্যার হেনরী বললেন, "আমার ভায়ের বামনগোয়াতো যাওয়া সম্বন্ধে আপনি কি শুনেছিলেন ?"

"আমি যা শুনেছিলাম, আজ পর্যন্ত তা দ্বিতীয় মানুষকে জানতে দেইনি," উত্তরে জবাব দিলাম, "শুনেছিলাম তিনি সলোমনের ধনভাণ্ডারের দিকে যাত্রা করেছেন।"

উত্তেজিতভাবে তাঁরা দুজনে তক্ষুনি একসঙ্গে বলে উঠলেন, "সলোমনের ধনভাণ্ডার ! কোথায় ?"

উত্তর দিলাম, "আমি নিজে জানি না। তবে এখানকার মানুষেরা যেটুকু বলে সেইটুকু জানি। তার কাছে কিনারের পাহাড়গুলোর চুড়োও আমি একবার দেখেছিলাম কিন্তু সে সময় আমার আর পাহাড়ের মাঝে ছিল একশো তিরিশ মাইলের মরুভূমি। কেবল একজন ছাড়া আর কোন সাদা মানুষ সেই মরুভূমি আজ পর্যন্ত পার হয়েছে বলেও আমি শুনিনি। যদি কথা দেন যে, আমার অনুমতি ছাড়া একথা আর কাউকে বলবেন না, তবেই সলোমনের ধনভাণ্ডারের কাহিনী যতদূর জানি, আমি আপনাদের কাছে বলতে পারি। সেই হবে সবচেয়ে ভালো। কিন্তু বলার আগেই যে আপনার কাছে আমি প্রতিশ্রুতি চাই তার কারণও অবিশ্যি আমার আছে—।"

স্যার হেনরী মাথানেড়ে সম্মতি জানালেন আর ক্যাপটেন গুড ও বলে উঠলেন "নিশ্চয়, নিশ্চয় !"

"বেশ"! বলে আমি সুরু করলাম, "দেখুন আপনাদের হয়তো ধারণা আছে যে, হাতী শিকারীরা মোটামুটি একরকম জংলী গোছেরই মানুষ হয়। নিজের জগতটুকু ও কাফিরদের চালচলন ছাড়া আর কোন কিছুরই খবর রাখেনা তারা। কিন্তু মাঝে মাঝে, আপনারা তাদের মধ্যেও হয়তো এমন লোকের সন্ধানও পেতে পারেন যারা দিশী লোকদের কাছ থেকে কিম্বদন্তী সংগ্রহ করতে মাথা ঘামায় আর তাই নিয়ে এই অন্ধকারাচ্ছন্ন দেশের টুক্‌রো ইতিহাস সৃষ্টি করারও চেষ্টা করে। প্রায় তিরিশ বছর আগে এই রকমের একজন লোকের মুখেই আমি প্রথম শুনি সলোমনের গুপ্তধনের কাহিনী। যদিও মনে সেদিন কিছুটা কৌতূহল জেগেছিল তবুও কথাটা শুনে তখন হেসেই উড়িয়ে দিয়েছিলাম। তারপর দীর্ঘ কুড়ি বছর কেটে গেলো—একটা হাতী শিকারীর পক্ষে সময়টা দীর্ঘই বলতে হবে, কারণ এ কাজে এতদিন এই সব লোকদের পরমায়ু থাকে না। যা হোক এই কুড়ি বছর পর আমি বিশেষ করে জানতে পারলাম সলোমন পর্বতের কথা আর সেই পাহাড় পেরিয়ে আর এক দেশের কাহিনী। সেবার আমি গিয়েছিলাম সিতান্দা ক্রয়াল বলে এক দুর্গম জায়গায়। সেখানে না পাওয়া যায় শিকার, না মেলে খাবার। সেখানে আবার ভীষণ জ্বরে আমায় ধরলো ঠেসে। সেই সময় একদিন এক পোর্তুগীজ তার দো-আঁসলা এক সঙ্গী নিয়ে সেখানে এসে হাজির হলো। রোগা লম্বা মতন লোকটা—বড় বড় কালো চোখ আর ছাই ছাই রংয়ের পাকানো গোঁফ। আমার সঙ্গে একটু গল্প-গুজব করলো সে। আমি কিছু কিছু পর্তুগীজ বুঝতে পারতাম আর সেও কিছুটা ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজী বলতে পারতো, কাজেই বিশেষ অসুবিধা হলো না। তার নাম বললে, 'জোসে সিলভেস্ত্রে,' বাড়ী দেলাগোয়া উপ-

সাগরের কাছে। পরদিন যাবার সময় পুরোনো চালে টুপি খুলে আমাকে সে বললো, "চললাম মশাই, এরপর যদি আমাদের আর কোন দিন দেখা হয়, তবে সেদিন আমাকে আপনি পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধনী বলেই জানবেন, হ্যাঁ, সেদিন আপনার কথা আমার স্মরণপথেই থাকবে।" আমি একটু হাসলাম, কারণ বেশী হাসবার মতন আমার তখন শক্তিই ছিল না। আমার বিস্ময়াবিষ্ট চোখের ওপর দিয়ে লোকটা পশ্চিমের দিগন্ত বিস্তৃত মরুভূমির দিকে মিলিয়ে গেলো। আমি ভাবতে লাগলাম—লোকটা পাগল! সে ওখানে কি খুঁজে পাবে সে-ই জানে!

সপ্তাহ খানেক কেটে যাবার পর জ্বরটা আমার সারার দিকেই গেলো। একদিন পড়ন্ত বেলায় আমার তাঁবুর সামনে মাটিতে বসে বহু মূল্যে কেনা একটা অখাদ্য মুরগীর শেষ ঠ্যাংটা চিবুতে চিবুতে সামনে মরুভূমির পারে তপ্তলাল পড়ন্ত সূর্যের দিকে তাকিয়ে দেখছিলাম; হঠাৎ আমার সামনে প্রায় শ'তিনেক গজ দূরে উঠে আসা ঢালু জমিটার ওধারে একটা মানুষের মূর্তি ভেসে উঠলো। গায়ে কোট দেখে তাকে ইউরোপীয় বলেই সন্দেহ হলো। মূর্তিটা তার হাঁটু আর পায়ের ওপর ভর করে হামা টানতে টানতে আসছিল। দেখলাম আসতে আসতে লোকটা বেশ কয়েকবার লুটিয়ে পড়লো, কিন্তু তাতে দমলো না, আবার উঠে হামা দিয়ে এগুতে লাগলো। কোন বিপদাপন্ন লোক মনে করে আমি তক্ষুনি আমার একজন শিকারীকে পাঠিয়ে দিলাম তার সাহায্যের জন্যে। অল্পক্ষণের মধ্যে সেখানে লোকটা এসেও পড়লো; লোকটা কে ছিল আপনারা কিছু আন্দাজ করতে পারেন কি?"

"নিশ্চয়ই!" ক্যাপটেন গুড্ বললেন, "জোসে সিলভেস্ত্রে।"

"হ্যাঁ, জোসে সিলভেস্ত্রে বা তার কঙ্কাল-সার দেহটাই বটে! দেখলাম পীতজ্বরে তার সমস্ত মুখখানা গাঢ় হল্‌দে হয়ে গিয়েছে। মড়ার খুলির মতন মাথাটা থেকে তার বড়বড় কালো চোখ জোড়া প্রায় ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। গায়ে মাংস বলতে তার আর কিছু ছিল না, শুধু হল্‌দে কাগজের মতন চামড়া আর সাদা লোমের তলা থেকে খোঁচা খোঁচা হাড়গুলো উঁকি দিচ্ছিল।"

"যিশুর দোহাই—জল!" বলে সে ককিয়ে উঠলো। দেখলাম তার ঠোঁটদুটো ফালাফালা হয়ে ফেটে গেছে আর সেই ফাটা ঠোঁটের মাঝ দিয়ে তার বিবর্ণ কালো ফোলা জিবটা বেরিয়ে ঝুলে রয়েছে।"

"জলের সঙ্গে খানিকটা দুধ মিশিয়ে তাকে খেতে দিলাম। বড়বড় ঢোকে এক দমে প্রায় সে দু'বোতল খেয়ে ফেললো। আরো পারতো কিন্তু তাকে আমি তার বেশী খেতে দিলাম না। তারপর আবার সে জ্বরে বেহুঁস হয়ে পড়লো। আর সেই জ্বরের ঘোরেই বলতে লাগলো সেই সুলেমান পর্বত, তার হীরে-মাণিক আর মরুভূমির কথা। তাকে আমি তাঁবুর মধ্যে নিয়ে গেলাম। সময়োপযোগী আমার সাধ্য মতন যতদূর করবার করলামও কিন্তু আমার মনে হলো সব শেষ হয়ে যাবে। রাত প্রায় এগারোটার সময় সে একটু শান্ত হয়ে এলে আমি বিশ্রামের জন্য একটু চোখ বুজলাম। ভোরের দিকে ঘুম ভেঙে গেলো। জেগে দেখি, একটা অদ্ভুত রকমের নির্জীব মূর্তির মতন সে উঠে বসে আবছা আলোয় মরুভূমির দিকে তাকিয়ে আছে। কিছু ক্ষণের মধ্যেই সূর্যালোকের প্রথম তীর আমাদের সামনের দিগন্ত বিস্তৃত প্রান্তর পার হয়ে সুদূর সুলেমান পর্বতের সবচেয়ে উঁচু চুড়োয় গিয়ে পড়লো।

"সেই মরণ পথযাত্রী লোকটা তার শীর্ণ লম্বা হাতটা তুলে বলে

উঠলো, "উই—উই খানটা—কিন্তু ওখানে আমি কোনদিনও পেঁছুতে পারবো না—কোনদিনও না। কেউ কখনও পারবে না।"

হঠাৎ থেমে গেলো সে, মনে হলো মনে মনে কি যেন সংকল্প করলো। আমার দিকে তাকিয়ে সে বলে উঠলো, "বন্ধু, ওখানে আছো ? আমার চোখ আঁধার করে আসছে।"

আমি বললাম, "আছি, এখন শুয়ে পড়ুন, একটু বিশ্রাম করুন।"

"হ্যাঁ," সে বলে উঠলো, "শীগগিরী আমি বিশ্রাম করবো, অনন্তকাল আমার বিশ্রামের সময় রয়েছে। শোন বন্ধু, আমি মরছি! তুমি আমার ওপর খুব ভালো ব্যবহার করেছো, আমি তোমাকে কাগজ-খানা দিয়ে যাবো। যে-মরুভূমি আমাকে আর আমার চাকরকে শেষ করেছে, সেই মরুভূমি পেরিয়ে তুমি যদি যেতে পারো তাহলে পারবে ওখানে পেঁছুতে।"

এই বলে সে নিজের সার্ট হাতড়ে হরিণের চামড়ার একটা তামাকের থলে বের করলো। এক টুকরো চামড়া দিয়ে থলের মুখটা বাঁধা ছিলো, অনেক চেষ্টা করেও বাঁধনটা খুলতে না পেরে সেটা আমার হাতে দিয়ে "এটা খোলো" বলাতে আমি খুললাম। খুলে তার ভেতর থেকে একটা ছেঁড়া হলদে রঙের কাপড়ের টুকরো টেনে বের করলাম। তার ওপর মরচে ধরা অক্ষরে কি একটা লেখা রয়েছে দেখলাম। সেই জীর্ণ কাপড়ের ফালিটার ভাঁজ থেকে বেরুলো একখানা কাগজ।

ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়ার জন্যে সে ধীরে ধীরে বলতে লাগলো, "ন্যাকড়ার ওপর ওই কাগজটার মধ্যেই সব কিছু আছে। এর মর্মোদ্ধার করতে আমার অনেক বছর লেগেছে। শোনো—আমার পূর্বপুরুষ রাজনৈতিক কারণে লিসবন থেকে এখানে আশ্রয়

প্রার্থী হয়ে আসেন। পোর্তুগীজদের মধ্যে তাঁরাই প্রথম এদেশের মাটিতে পা দেন! যে পাহাড়ে কোনদিন কোনও শ্বেত জাতির পদচিহ্নও পড়েনি, সেই পাহাড়ে মারা যাবার আগে তিনি এটা লিখে যান, তাঁর নাম ছিল জোসে ড্যা সিল্‌ভেস্ত্রে। সে হলো আজ তিনশো বছর আগেকার কথা। ক্রীতদাসটি ঐ পাহাড়েই তাঁর সঙ্গে সঙ্গে থাকতো, তাঁকে মৃত দেখতে পেয়ে লেখাটি দেলাগোয়ার বাড়ীতে নিয়ে আসে। সেই থেকে ওটা আমাদের পরিবারেই রয়ে যায়, কিন্তু কেউ কোনও দিন ওটা পড়বার চেষ্টাও করেনি। অবশেষে আমিই একদিন ওর সারমর্ম উদ্ধার করি। এরই জন্যে আজ আমি জীবন দিতে বসেছি। কিন্তু হয়তো অন্য কেউ কৃতকামী হতে পারে আর তাই হয়ে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধনী বলেও পরিগণিত হতে পারে। একটা কথা, কাউকে এটা দিও না। তুমি একলা যেও।" তারপর আবার সে ভাবতে লাগলো বটে—কিন্তু ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই সব শেষ হয়ে গেলো।

নিশ্চল নিস্তব্ধতায় তার মৃত্যু ঘনিয়ে এলো! গভীর কবর খুঁড়ে আমি তাকে সমাধিস্থ করলাম। পাছে তার দেহ শিয়ালে টেনে তুলে বার করে সেজন্যে বড় বড় পাথর চাপিয়ে দিলাম সেই কবরের ওপর। তারপর ফিরে এলাম।

স্যার হেনরী অত্যন্ত অবাক ও কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করলেন, "কিন্তু সেই দলিলের কি হলো?"

ক্যাপ্‌টেনও সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, 'হ্যাঁ, সেই দলিল—তাতে ছিল কি?'

"বেশ, আপনারা তা যদি শুনতে চান, তবে বলছি সে কথা। আমার মৃত স্ত্রীকে ছাড়া আর কাউকেই সে কাগজ দেখাইনি। সে

এ সব কথা একদম বাজে বলেই মনে করতো। একটা মাতাল পোর্তুগীজ আমাকে এটা অনুবাদ করে দেয়। আসল ছেঁড়া টুকরোটা ডারবানে অনুবাদ সমেত আমার বাড়ীতেই আছে। তবে আমার পকেট বইতে তার একটা ইংরেজী অনুবাদ আর ম্যাপের নকল রেখেছি এই দেখুন" বলে লেখাটা মেলে ধরলাম।

"আমি জোসে ড্যা সিল্‌ভেস্ত্রে, দক্ষিণ সীমান্তের দুই পর্বত—'সেবার বক্ষ' ব'লে যার নামকরণ করেছি, তারই উত্তর দিকের তুষার বিহীন উচ্চ অগ্রভাগের এক গুহায় ক্ষুধায় মুমূর্ষু হয়ে, ১৫৯০ সালে, আমার শেষ বস্ত্রখণ্ডের ওপর এক হাড়ের ফলা দিয়ে লিখে যাচ্ছি—আমারই রক্ত করেছি এই লিখনের কালি। যদি আমার ক্রীতদাসেরা একে কোন দিন খুঁজে পায় আর যদি আমার দেলাগোয়াতে নিয়ে আসে, তবে আমার বন্ধু,—(নাম অস্পষ্ট) যেন বিষয়টি এমনভাবে সম্রাটের গোচরীভূত করেন, যাতে তিনি এখানে একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। যদি সেই সৈন্যদল মরুপর্বত পার হয়ে বীর কুকুয়ানেজ আর তাদের পুরোহিতদের ভৌতিক কলাকৌশলকে পরাজিত ক'রে এখানে পোঁছুতে পারে, তবে সলোমনের পর তিনিই নিশ্চয় হবেন ধনীশ্রেষ্ঠ সম্রাট। শ্বেত-মৃত্যুর পটভূমিকায় আমি নিজের চোখে দেখেছি সম্রাট সলোমনের ধনভাণ্ডারের অপরিমেয় হীরা-মানিকের রাশি। ডাইনীর ওঝা গাগুলের বিশ্বাসঘাতকতার জন্য আমি কেবল মাত্র আমার প্রাণ ছাড়া আর কিছুই নিয়ে আসতে পারিনি সেখান থেকে। যদি কেউ পারে, তবে সে যেন এই মানচিত্র অনুসরণ ক'রে সেবা পাহাড়ের বাম বক্ষের তুষার মালা অতিক্রম ক'রে সর্বোচ্চ গোলাকৃতি শৃঙ্গে যায়। এরই উত্তর দিকে বিস্তৃত সলোমনের প্রশস্ত রাজপথ। সেখান থেকে সম্রাটের প্রাসাদ

তিনদিনের পথ। যে পৌঁছুবে সে যেন গাগুলকে হত্যা করে। আমার আত্মার জন্য প্রার্থনা করে। বিদায়!

জোসে ছ্যা সিলভেস্ত্রে'

এই কাহিনী বলা শেষ করে, কালির বদলে নিজের রক্ত দিয়ে লেখা সেই মরণোন্মুখ বৃদ্ধের হাতে আঁকা ম্যাপের নকল তাঁদের দেখালাম। এরপর একটা আশ্চর্যজনক নিস্তব্ধতা বিরাজ করতে লাগলো।

ক্যাপ্‌টেন গুড্ বলে উঠলেন, "তামাম দুনিয়া আমি দু—দুবার ঘুরে এসেছি আর প্রায় সব বন্দরেই একবার করে ঢুঁ ও মেরেছি, কিন্তু দিব্যি ক'রে বলতে পারি, এ ধরণের কোন গল্পের কোন সূত্রও কোন বইতে আছে বলে বাবা শুনিনি!"

"একটা অদ্ভূত কাহিনী শোনালেন মিঃ কোয়াটার মেইন," স্যার হেনরী বললেন। "আশা করি আপনি আমাদের এটা একটা দম্‌বাজী ছাড়লেন না। আমি জানি, আনাড়ী নতুন লোকদের কাছে এইরকম গাল-গল্প বেশ চলে যায়।"

বেশ একটু ক্ষুণ্ণ হয়েই কাগজখানা পকেটে পুরতে পুরতে বললাম, "স্যার হেনরী, আপনি যদি তাই মনে করেন তবে এইখানেই এর শেষ", বলে আমি যাবার জন্যে উঠে দাঁড়ালাম।

স্যার হেনরী তাঁর দীর্ঘ হাতখানি আমার কাঁধের ওপর রেখে বললেন, "বসুন, বসুন মিঃ কোয়াটার মেইন, আমি আপনার কাছে মাপ চাইছি; আমি বেশ বুঝতে পারছি যে, আমাদেরকে ধাপ্পা দেবার ইচ্ছা আপনার একটুও নেই, তবে কি জানেন গল্পটা এমন অদ্ভুত যে, বিশ্বাস করতেই আমার মন চাইছে না।"

আমার অদ্ভূত কাহিনীর সত্যতা সম্বন্ধে তাঁদের ধারণার কথা বিবেচনা করে একটু নরম হয়েই জবাব দিলাম, 'ডারবানে পৌঁছে

আপনি আসল ম্যাপ আর লেখাটা দেখতে পাবেন। যাহোক আপনার ভায়ের কথা এখনও বলা হয়নি। যে লোকটি তাঁর সঙ্গে ছিল তাকে আমি চিনতাম। তার নাম জিম। বেচুয়ানা দেশের লোক সে। বেশ ভালো শিকারী আর দিশী লোক হিসাবে ছিল বেশ চালাক-চতুরই। যেদিন মিঃ নেভিলের যাবার কথা, সেইদিন সকাল বেলা সে আমার গাড়ীর পাশে দাঁড়িয়ে তামাক কাটছিল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'হ্যাঁরে জিম, এবারে তোরা কোথায় যাচ্ছিস ? হাতী শিকারে ?'

'না বাআস,' (বাআস্—শ্বেতকায় মনিব স্থানীয় ব্যক্তিদিগকে সম্বোধন অর্থে ঐ দেশীয় প্রচলিত শব্দ) সে জবাব দিলো, 'হাতীর দাঁতের চেয়ে ঢের দামী জিনিসের খোঁজে চলেছি।' 'কিরে' ? আমি কৌতূহলী হয়ে উঠলাম, 'সোনা ?' 'না বাআস্' তার চেয়েও দামী।' বলে সে দাঁত বেঁকিয়ে উঠলো।

আমি আর কিছু প্রশ্ন করলাম না। কারণ প্রকাশ্য কৌতূহল দেখিয়ে নিজের সম্মান ক্ষুণ্ণ করতে আর আমার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু কথাটা আমাকে বেশ বিচলিত করে তুলেছিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই জিমের তামাক কাটা শেষ হয়ে গেলো। 'বাআস্' সে বলে উঠলো।

'আমি তার কথায় কর্ণপাতই করলাম না।'

সে আবার ডাক দিলো, 'বাআস্'।

'কিরে ব্যাটা কি ?' আমি বল্‌লাম।

'বাআস্, আমরা হীরের সন্ধানে চলেছি।'

'হীরে! তাহলে তোরা তো ভুল পথে চলেছিস, খনির পথে যাওয়া উচিত।'

'বাআস্, সুলিমান পাহাড়—মানে সলোমন পাহাড়ের নাম শুনেছো ?

'অঃ !'

সে জিজ্ঞাসা করলো, 'সেখানকার হীরের খবর কিছু জানো ?'

'হ্যাঁ, একটা আজগুবি গল্প শুনেছি বটে !'

'আজগুবি নয় বাআস্। একবার ছেলে কোলে এক মেয়েমানুষ ওখান থেকে এসেছিলো, তারই কাছ থেকে আমি সব শুনেছি !'

'সুলিমানের দেশে যেতে গেলে তোর মুনিবকে শকুনিদের পেটে যেতে হবে আর তুইও বাঁচবি বলে মনে করিস্ নি !'

সে দাঁত ভেঙচি দিয়ে বলে উঠলো, 'হতে পারে তা বাআস্, মানুষ তো মরবেই একদিন তাই একটা নতুন দেশে এবার ভাগ্য পরীক্ষা করে দেখতে চাই'।

'হুঁরে ব্যাটা !' আমি বলে উঠলাম, 'সবুর কর, সেই কাঁকলাস বুড়ো যম এসে যখন তোর হল্‌দে টুঁটিটা চেপে ধরবে, তখন শুনবো কোন্ সুর তোর শ্রীবদনে বেরোয় ।'

আধঘণ্টা পরে দেখতে পেলাম, মিঃ নেভিলের গরুর গাড়ীগুলো চলেছে। জিম ছুটতে ছুটতে ফিরে এলো। 'বিদায় নিতে এলাম, বাআস্' সে বললো, 'তোমাকে না বলে যেতে ইচ্ছা করছিল না মোটেই। তুমি নিশ্চয়ই ঠিক বলছো, আমরা কোনও দিন আর ফিরে আসবো না।'

'হ্যাঁরে সত্যিই তোর মুনিব সুলিমান পাহাড়ে চলেছে, না তুই মিথ্যে করে বলছিস্ জিম ?'

'মিথ্যে নয়' সে জবাব দিলো, 'সত্যিই তিনি যাচ্ছেন।' আমাকে তিনি বলেছেন যে, যেমন করেই হোক তাঁকে তাঁর কপাল ফেরাতে হবে বা তার জন্যে চেষ্টা করতে হবেই—কাজেই এই চেষ্টায় ক্ষতি কি ?'

'ও!' আমি বল্‌লাম, 'একটু দাঁড়া জিম, এই চিঠিটা তোর মুনিবের হাতে দিবি কিন্তু কথা দে, ইন্‌ইয়াতিতে (প্রায় একশো মাইল দূর) তোরা না পৌঁছুনো পর্যন্ত এই চিঠির কথা কিছু বল্‌বিনা।'

'রাজী', সে বললো।

আমি এক টুকরো কাগজের ওপর লিখলাম, 'যদি কেউ পারে সে যেন............সেবা পাহাড়ের বাম বক্ষের তুষারমালা অতিক্রম ক'রে সর্বোচ্চ গোলাকৃতি শৃঙ্গে যায়। এরই উত্তর দিকে বিস্তৃত সলোমনের প্রশস্ত রাজপথ ইত্যাদি', তারপর সেটা তার হাতে দিয়ে বললাম, 'জিম, তোর মুনিবকে যখন এটা দিবি, তখন বলবি তিনি যেন এর উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন। কিন্তু খবরদার এখন এটা তাঁর হাতে দিস্ নি। কারণ আমি চাই না যে, তিনি আবার ফিরে এসে আমাকে সব নানান জিজ্ঞাসাবাদ করেন। যা-যা, এখন ছোট্ ছোট্ ; গাড়ীগুলো প্রায় অদৃশ্য হতে চললো।'

জিম কাগজটা নিয়ে চলে গেলো। 'আপনার ভায়ের বিষয় জ্ঞাতব্য যা কিছু এইখানেই শেষ, স্যার হেনরী।'

স্যার হেনরী বলে উঠলেন, 'মিঃ কোয়াটার মেইন, আমি আমার ভায়ের খোঁজে বেরিয়েছি, যদি দরকার হয় তবে যে পর্যন্ত না আমি তাকে খুঁজে পাই বা জানতে পারি যে সে মৃত, সে পর্যন্ত আমি স্থলিমান পাহাড় পেরিয়েও তার অনুসন্ধান করবো। আপনি কি যাবেন আমার সঙ্গে ?'

আমি সাবধানী আর ভীরু প্রকৃতির ছিলাম, কাজেই এই রকম কথা শুনে পিছিয়েই গেলাম। আমার মনে হলো এই রকম ভাবে যাওয়া মানে, নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে পড়া, আর অন্যসব কথা ছেড়ে দিলেও আমার মানুষ করার মতন একটি ছেলে ছিল, সেই জন্য তক্ষুনি মৃত্যুর

জন্য প্রাণটা সঁপে দিতে নারাজ ছিলাম। তাই জবাবে বলে উঠলাম, 'ধন্যবাদ স্যার হেনরী! দেখুন, এসব কাজে পণ্ডশ্রম করার মতন বয়স আর আমার নেই। এতে আমরা, আমাদের বন্ধু সিলভেস্ত্রের মতই শেষ হয়ে যাবো। তা ছাড়া আমার একটি নাবালক ছেলেও রয়েছে কাজেই জীবনটাকে বাজী ধরতে রাজী নই।'

স্যার হেনরী আর ক্যাপ্‌টেন গুড্ দুজনেই আমার কথা শুনে খুব নিরাশ হয়ে পড়লেন।

স্যার হেনরী বললেন, 'দেখুন মিঃ কোয়াটার মেইন, আমার অবস্থা বেশ সচ্ছলই আর একাজ আমি করবোই। এই কাজে আমাকে সাহায্য করার জন্যে আপনি যুক্তিপূর্ণ যে কোন মূল্যের উল্লেখ করতে পারেন। আমাদের যাত্রার পূর্বেই সেই টাকা আপনাকে দিয়ে দেবো। এ ছাড়াও যাবার আগে আমি কথা দিচ্ছি যে, যদি এই যাত্রায় আমাদের বা আপনার কিছু হয়, আপনার সন্তানের যথোপযুক্ত ভবিষ্যতের ব্যবস্থাও আমি করে যাবো। এর থেকে বোধ করি আপনি বুঝতে পারবেন যে, আপনার সাহায্য আমরা কতখানি কামনা করি। আর, আর এও বলছি যে, যদি আমরা দৈবাৎ সেই জায়গায় গিয়ে পৌঁছুই আর যদি হীরের খনির সন্ধান পাই, তবে তার অধিকারী হবেন সমানভাবে আপনি আর ক্যাপ্‌টেন গুড্। আমার ওসব ধন-সম্পদের প্রয়োজন নেই। যদিও সবটাই অনিশ্চিতের ব্যাপার তবু বলি মিঃ কোয়াটার মেইন, চুক্তির দিক থেকে আপনার যা বলার আছে বলুন। হ্যাঁ, আর একটা কথা, এই যাত্রার সমস্ত খরচটাই যে আমার এ কথাও নিশ্চিত জেনে রাখুন।'

আমি বল্‌লাম, 'স্যার হেনরী, আমি জীবনে কখনো এর চেয়ে বেশী প্রতিদানের প্রতিশ্রুতি পাইনি। আমার মতো দরিদ্র শিকারী ও ব্যবসা-

দারের পক্ষে একে একেবারে নস্যাৎ করে উড়িয়ে দেওয়াও কঠিন। আজ পর্যন্ত যে সব কাজে আমি নেমেছি তার মধ্যে এটাই সবচেয়ে কঠিন, কাজেই পাকা কথা দেবার আগে আমি একটু ভেবে নেবার সময় চাই। ডারবানে পৌঁছুবার আগেই আপনাকে আমার মতামত জানাবো'।

"বেশ ভালো কথা," বলে স্যার হেনরী আমাকে "গুড্‌নাইট" জানিয়ে চলে গেলেন। আমিও বিদায় জানিয়ে নিজের জায়গায় ফিরে গেলাম।

উমবোপার চাকরী

কয়েকদিন পরের কথা। আমাদের জাহাজ প্রায় ডারবানে এসে পড়েছে। সন্ধ্যার দিকে সমুদ্রের বুকে চাঁদ উঠলো।

স্যার হেনরী, ক্যাপ্টেন গুড্, আমরা সবাই জাহাজের চাকার দিকটায় বসেছিলাম। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর স্যার হেনরী নিস্তব্ধতা ভগ্ন করলেন, 'কি মিঃ কোয়াটার মেইন, আমার প্রস্তাব সম্বন্ধে আপনি কিছু ভাবলেন ?'

'হ্যাঁ, মিঃ কোয়াটার মেইন' ক্যাপ্টেন গুড্ প্রতিধ্বনি করে উঠলেন, 'আশাকরি আপনাকে সলোমনের ধনভাণ্ডার পর্যন্ত আমরা সাথী হিসাবে পাচ্ছি।'

কথার উত্তর দেবার আগে আমি উঠে দাঁড়িয়ে ঠুকে ঠুকে পাইপ থেকে পোড়া তামাকটা ফেলে দিলাম। তখনও আমি কিছুই স্থির করতে পারিনি। কিছু একটা স্থির করার জন্য এ যেন একটু অতিরিক্ত সময় খুঁজে ছিলাম। জ্বলন্ত তামাকটা সমুদ্রের জল ছোঁয়ার আগেই মন স্থির করে ফেললাম। এই অতিরিক্ত মুহূর্তটা একটা অদ্ভূত কাজ করে গেলো। কোন জিনিস নিয়ে যখন আমরা গভীর ভাবনায় পড়ি তখন এমনি করেই মাত্র কয়েকটি মুহূর্তেই তার সমাধান হয়ে যায়!

সেখানেই আবার বসে পড়ে আমি জবাব দিলাম, 'হ্যাঁ মশাই, আমি যাবো, আর আপনাদের অনুমতি হ'লে বলি যে, আমি কেন যাবো এবং আমার যাবার সর্তই বা কী-কী। প্রথমে সর্তের কথাই বলি।

'১। আপনাকে এ যাত্রার সমস্ত ব্যয় বহন করতে হবে এবং এই যাত্রায় যা কিছু ধন-সম্পদ পাওয়া যাবে তা ক্যাপ্‌টেন গুড্‌ আর আমার মধ্যে সমান ভাবে ভাগ করে দিতে হবে।

'২। যে পর্যন্ত আপনারা এই অভিযান পরিত্যাগ না করেন বা যে পর্যন্ত না আমরা কৃতকার্য হই বা যে পর্যন্ত না আমরা বিপদে বিচ্ছিন্ন হই সে পর্যন্ত অত্যন্ত বিশ্বস্তভাবে আপনাদের কাজে নিযুক্ত থাকার জন্য, যাত্রার পূর্বে আপনাকে আমার কাজের অগ্রিম স্বরূপ ৫০০ শো পাউণ্ড দিতে হবে।

'৩। যাত্রার পূর্বে এই মর্মে আপনাকে এক চুক্তি দলিল করতে হবে যে, আমার মৃত্যু হলে বা অক্ষম হয়ে পড়লে আপনি আমার ছেলে হ্যারীকে—সে এখন লণ্ডনে ডাক্তারী পড়ছে—উপার্জনক্ষম না হওয়া পর্যন্ত বাৎসরিক ২০০শো পাউণ্ড হিসাবে পাঁচ বছর কাল টাকা দেবেন। ব্যস্ এই আমার বক্তব্য। আমি জোর করেই বলতে পারি বোধ হয় দাবীটা আপনাদের কাছে বেশ বেশীই মনে হচ্ছে।'

'না,' স্যার হেনরী বলে উঠলেন, 'আপনার দাবী আমি আনন্দের সঙ্গেই মেনে নিচ্ছি। আমি একাজে যে নামবো তা স্থিরই আর যেহেতু আপনি এ বিষয়ে বিশেষ জ্ঞানী, সেই জন্য আপনার সাহায্যের দরুণ আপনার দাবীর অতিরিক্ত মূল্যও আমি দেবো'

* * * *

পরের দিন আমরা জাহাজ ছেড়ে তীরে উঠলাম। স্যার হেনরী আর ক্যাপ্‌টেন গুড্‌কে গরীবের বাড়ীতেই ওঠালাম। কয়েক দিনের মধ্যেই একজন আইনজীবীর সাহায্যে চুক্তিনামা করা সম্বন্ধে যা কিছু করার সব শেষ করে, আমার প্রাপ্য ৫০০শো পাউণ্ডের চেক্‌টি পকেটে

পুরলাম। মনস্থির হওয়াতে এইবার যাত্রার জন্য তৈরী হতে সুরু করে দিলাম।

প্রথমে, স্যার হেনরীর পক্ষ থেকে আমি একখানা চার-চাকার গাড়ী আর একজোড়া চমৎকার ষাঁড় কিনলাম। গাড়ীটা লম্বায় হলো কুড়িফিট্; চাকায় লোহার আল আর আগাগোড়া মজবুত কাঠ দিয়ে তৈরী। হীরের খনিতে একক্ষেপ গিয়ে ফিরে আসা বলে, যদিও গাড়ীটা একদম নতুন হলো না, তবু আমার মনে হলো এতে উল্টে আরও ভালোই হলো, কারণ রোদে জলে গাড়ীর কাঠগুলো এর মধ্যে বেশ মজবুত হয়ে উঠেছিল। গাড়ীটা কিনতে যদিও ১২৫ পাউণ্ড আমার খরচা হয়ে গেলো, তবুও মনে হয়, ও দামে বেশ সস্তাতেই হলো।

তারপরই কাজ হলো, ভবিষ্যতের জন্যে খাবারের সংস্থান রাখা আর ওষুধ-পত্রের ব্যবস্থা করা। ঐ কাজটাই ছিল সবচেয়ে ঝুঁকির কাজ। কারণ এদিকে যাতে বাজে জিনিসে গাড়ী ভর্তি হয়ে না ওঠে সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে আবার অন্যদিকে অবশ্য দরকারী কোনও জিনিসই ফেলে যাওয়া চলবে না। সৌভাগ্যবশতঃ দেখা গেলো যে, মিঃ গুডের ডাক্তারী সম্বন্ধে কিছু কিছু জ্ঞান আছে। কারণ তাঁর পূর্বেকার কর্মজীবনে ডাক্তারী আর অস্ত্রোপচার সংক্রান্ত পরীক্ষায় পাশ করতে হওয়াতে সে বিদ্যের অল্প-বিস্তর তিনি তখনও বজায় রেখেছিলেন।

এই প্রশ্নের মীমাংসা নিশ্চিন্তে হয়ে যাবার পরও দুটো দরকারী ব্যবস্থা সমাধান করতে রয়ে গেলো। একটা হলো অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবস্থা, অপরটি চাকর-বাকর জোগাড়। শেষ পর্যন্ত আমরা যা যা অস্ত্র নেওয়া ঠিক করলাম, আমার বইয়ের পাতা থেকে তার নকল এখানে দেওয়া গেলো।

তিনটে হাতী শিকার করা ভারী বন্দুক। মাঝারী-রকম শিকারের জন্য, বিশেষ করে খোলা জায়গায়—তিনটে ডবল ৫০০ এক্সপ্রেস বন্দুক। একটা ১২ নম্বর দোনলা বন্দুক। তিনটে উইনচেষ্টার রিপিটিং রাইফেল। তিনটে কোল্ট রিভলবার।

এই হলো আমাদের মোটামুটি অস্ত্রের তালিকা। অস্ত্রগুলি সবই ছিল এক কোম্পানীর তৈরী, একই জাতের। ফলে এদের গোলাগুলি সহজেই পাল্টা-পাল্টি করা চলতো।

কিন্তু সমস্যা দাঁড়ালো আমাদের চাকর-বাকর নির্বাচন নিয়ে। অনেক পরামর্শের পর স্থির হলো আমরা পাঁচজন মাত্র লোক সঙ্গে নেবো। গাড়ীর একজন চালক, একজন সর্দার আর তিনটে চাকর। প্রথম জনকে সহজেই পাওয়া গেলো কিন্তু গোল বাঁধলো তিনজন চাকর নিয়ে। আমরা যে কাজে পা বাড়িয়েছিলাম সে কাজে দরকার ছিল অত্যন্ত বিশ্বাসী এবং সাহসী লোকেরই। কারণ তাদের জন্য ভবিষ্যতে আমাদের জীবন বিপন্নও হতে পারে। যাহোক অবশেষে আমি দু'জন লোক ঠিক করলাম। ভেন্‌তভোগেল (বায়বীয় পক্ষী) নামে একজন হটেন্‌টট্‌ জাতের লোক আর খিভা নামে একজন জুলু। খিভা সুন্দর ইংরেজী বলতে পারতো। ভেন্‌তভোগেলকে অবশ্য আগেই আমি জানতাম। শিকার খুঁজে বার করতে সে ছিল একটি ওস্তাদ গোছের লোক। চাবুকের দড়ার মত শক্ত—ক্লান্ত হতো না কিছুতেই।

এই দু'জনকে ঠিক করার পর উপযুক্ত তৃতীয়জনের খোঁজ না পেয়ে হতাশ হয়ে পড়লাম। ভবিষ্যতে তাকে যাত্রা পথে ভাগ্যের জোরে পেয়ে যাবো মনে করে, একজন কমেই যাত্রা সুরু করা স্থির করলাম। কিন্তু যাওয়ার ঠিক আগের দিন সন্ধ্যাবেলা খিভা খবর দিলো যে, একজন কাফির আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়। খাওয়া-দাওয়ার পর

খিভাকে আমাদের কাছে লোকটিকে নিয়ে আসতে বললাম। অবিলম্বে লম্বা, প্রিয়দর্শন, বছর তিরিশ বয়সের একজন জুলু ঘরে এসে প্রবেশ করলো। লোকটা তার মুণ্ডিওয়ালা লাঠীটা তুলে সেলাম জানিয়ে, এককোনে ঘাড় গুঁজে উবু হয়ে চুপ করে বসলো। আমি কিছুক্ষণ তার দিকে ফিরেই তাকালাম না। কারণ ওরকমটি না ক'রে ওদের সঙ্গে প্রথম চোটেই কথা আরম্ভ করলে ওরা আলাপাচারীকে একেবারে ফাল্‌তু লোক বলে ধরে নেয়।

যাহোক আমি লক্ষ্য করলাম যে লোকটা 'খেশ্‌লা'—অর্থাৎ মাথায় আংটি পরা জাতের লোক। সাধারণতঃ বিশিষ্ট বয়স বা পদ মর্যাদা লাভ করলে, জুলুরা একরকমের আটাকে চর্বি দিয়ে পালিশ করে নিয়ে মাথায় লাগিয়ে গোল আংটির মতন করে পরে। আমার মনে হলো, লোকটাকে আমি কোথায় দেখেছি!

আমি শেষে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এই তোর নাম কিরে ?'

ধীরে অথচ ভারী গলায় সে জবাব দিলো, 'উম্‌বোপা'।

'তোকে যেন আগে দেখেছি মনে হচ্ছে ?'

'আজ্ঞে, হুজুর মা-বাপ! ইশান্‌ধলওয়ানায় যুদ্ধের আগের দিন আমাকে দেখেছিলেন।'

জুলু যুদ্ধের কথা আমার স্মরণ পথে এলো। বললাম' হ্যাঁ, মনে পড়েছে, তা এখন কি চাস ?'

আমার স্থানীয় চল্‌তি নামটির উল্লেখ করে সে জবাব দিলো, 'মাকুমাজাহন' (অর্থাৎ—যে মাঝ রাতে জাগে বা যে চোখ খুলে রাখে) শুনলাম আপনি নাকি সাগর পারের শ্বেতকায় সর্দারদের নিয়ে সেই উত্তুরে খুব একটা বড় কাজে যাচ্ছেন, কথাটা কি ঠিক ?'

'হ্যাঁ।'

'শুনলাম এখান থেকে এক চাঁদের পথ পেরিয়ে মানিকাদের দেশ ছাড়িয়ে সেই লুকাঙ্গা নদীতেও যাবেন—এসবও কি ঠিক নাকি, মাকুমাজাহন্ ?'

'কোথায় আমরা যাবো কি না যাবো সে কথায় তোর এতো খোঁজের দরকার কি ?' আমি সন্দেহভরে কথাটা জিজ্ঞাসা করলাম। কারণ আমাদের যাত্রার উদ্দেশ্যটা অত্যন্ত গোপন রাখা হয়েছিল।

'আজ্ঞে আর কিছুই না, আপনারা যদি সত্যই অতো দূরে যান তবে আমি আপনাদের সাথে যাবো।'

লোকটার বলার দৃপ্ত ভঙ্গী দেখে আমার কি রকম মনে হলো। জিজ্ঞাসা করলাম, 'তোর বাড়ী কেথায় ? তোর খবরাখবর আমাদের আগে বল্ দেখি শুনি।'

উত্তরে উম্‌বোপা বললো যে, সে এদেশের লোক নয়। তার বাড়ীঘরও এখানে কিছুই নেই। সে সুদূর উত্তরের অধিবাসী। শিশুকালে সে উত্তুরে দেশ থেকে জুলুদের সঙ্গে এখানে আসে। সেই থেকে সে অনেক জায়গায় ঘুরেছে। দিশী সর্দারদের অধীনে সৈন্যের কাজ করেছে। যুদ্ধবিদ্যা ভালই জানে। শ্বেতকায়দের আচার আচরণ দেখবার জন্য সে জুলুদের কাছে থেকে পালিয়ে নাতালে আসে। জুলুযুদ্ধে সে লড়াইও করেছে। সেই থেকে নাতালেই আছে। কিন্তু এখন সে আবার উত্তরে ফিরে যাবার জন্যে বড়ই উন্মনা হয়ে উঠেছে। টাকা পয়সা কিছু চায় না শুধু তার গুণের জোরেই সে চায় আহার এবং আশ্রয়।

লোকটার কথাবর্তায় আমি একটু কেমন হয়ে গেলাম। তার বলার ঢং দেখে সে যে সত্য বলছে এ সম্বন্ধে আমার কোন সন্দেহ হলো না। তবে তাকে সাধারণ জুলুদের থেকে অন্য রকমের মনে হলো। কারণ

বিনা মাইনে তার এই চাকরী করার প্রস্তাব আমার কাছে কেমন লাগতে লাগলো। একটু মুস্কিলে পড়েই তার কথা অনুবাদ করে স্যার হেনরী এবং গুড্‌কে জানালাম ও তাঁদের মতামত জানতে চাইলাম।

স্যার হেনরী তাকে উঠে দাঁড়াবার জন্যে আমাকে বল্‌লেন। উমবোপাও দাঁড়িয়ে উঠলো। তার গা থেকে লম্বা মিলিটারী কোট্‌টাও খুলে ফেললো। লোকটাকে দেখে একটা বেশ জোয়ানের মতন জোয়ান মনে হলো। ওর পরণে ছিল কেবলমাত্র 'মুচা' বা কটিবাস আর গলায় সিংহ নখের মালা। ছ'ফুট তিন ইঞ্চি লম্বা, বুকটাও সেই অনুপাতে চওড়া। সমস্ত শরীরের গঠনটা অতি সুন্দর। দু' একটা ক্ষতের দাগ ছাড়া তার গায়ের রঙও তেমন ময়লা লাগছিল না। স্যার হেনরী উঠে কাছে গিয়ে তার গর্বব্যঞ্জক সুশ্রী মুখের দিকে তাকালেন।

ক্যাপটেন গুড্‌ বলে উঠলেন, 'এরা দুটিতে বেশ জুড়ি হয়েছে না? দুজনেই কেমন সমান সমান!'

স্যার হেনরী ইংরাজীতে বললেন, 'উমবোপা, তোমাকে আমার বেশ ভালো লাগছে। তোমাকে আমরা নেবো।'

উমবোপা বোধ হয় কথাটা বুঝলো, কারণ সে জুলুতে উত্তর দিলো, 'বেশ ভালোই।' তারপর স্যার হেনরীর দীর্ঘ সুঠাম শরীরের দিকে তাকিয়ে মন্তব্য করলো, 'আপনি আর আমিই হচ্ছি মরদ!'

যাত্রা হলো স্নুরু

জানুয়ারীর শেষে আমরা ডারবান থেকে অজানার সন্ধানে পা বাড়ালাম। পথের বিপদাপদের কথা তুলে এখানে আর পাঠকদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাতে চাই না।

মাতাবিলির শেষ ঘাঁটি, ইন্‌ইয়াতিতে আমাদের গাড়ী আর ষাঁড়গুলোকে দু'জন চাকরের জিম্মায় রেখে আমরা আরও দুর্গমের দিকে যাত্রা করলাম। সঙ্গে রইলো খিভা, ভেন্‌তেভোগল, উম্‌বোপা। মাল-পত্র বইবার জন্যে জন বারো কুলি সেখান থেকে নিয়ে নেওয়া হলো।

হাঁটা পথেই আমরা চলেছি। কারু মুখে কথা নেই। মনে হলো সবাই যেন ভাবছে, কোনদিন আবার ফিরে এসে এসব দেখতে পাবো কিনা কে জানে! সবার আগে চলেছে উম্‌বোপা। সেই একমাত্র কথাবার্তায় আমাদের চাঙ্গা করে রেখেছে। লোকটা বেশ আমুদে— মাঝে মাঝে একটু চিন্তা করা ছাড়া সব সময়ই খুসিতে থাকে। আমাদের সবায়েরই সে বেশ প্রিয়।

পনেরো দিনের পথ চলার পর এখন একটা অদ্ভুত সুন্দর জ'লো বনের মধ্যে দিয়ে চলেছি। পাহাড়ের চূড়োগুলো ঘন গাছ গাছড়ায় ঢাকা। কোথাও কাঁটা ঝোপ, কোথাও বা 'মাচাবেল' গাছে চোখ জুড়ানো হলদে ফল ধরে আছে। হাতীর প্রিয় খাদ্য এই গাছ। আশ-পাশের গাছের দুর্দশা দেখেই বোঝা যায় এখানে হাতীর অভাব নেই। হাতী তো শুধু খায় না নষ্টও করে ভীষণ। সমস্ত দিনের পর

সন্ধ্যেবেলা একটা অদ্ভূত সুন্দর জায়গায় পৌঁছুলাম। জঙ্গলেভরা পাহাড়ের তলায় একটা নদীর শুকিয়ে যাওয়া খাত। এখানে ওখানে স্ফটিক-স্বচ্ছ জলের ডোবা, তার চারিদিক ঘিরে বন্য জন্তুদের পায়ের দাগ। নদীর খাতে নামতেই একদল জিরাফ আমাদের দেখে পিঠের ওপর লেজ পাকিয়ে খটাখট্ খটাখট্ করে ছুট্ দিলে। প্রায় তিনশো গজ দূর দিয়ে তারা দৌড়ে যাচ্ছিল কাজেই বন্দুকের আওতার বাইরেই তাদের মনে হলো। মিঃ গুড্ আগে আগে যাচ্ছিলেন। তার কি খেয়াল হলো, লোভ সামলাতে পারলেন না। বন্দুক তুলে সবশেষের জিরাফটার দিকে লক্ষ্য করে ঘোড়া টিপে দিলেন। গুলিটা দৈবক্রমে জিরাফটার গলার পিছনে, ঘাড়ে সোজা লেগে শিরদাঁড়াটা চূরমার করে দিলো। একটা খরগোসের মত ডিগবাজী খেয়ে জিরাফটা গড়িয়ে পড়লো।

কাফিরগুলো চেঁচিয়ে উঠলো, 'সাবাস বাউগওয়ান্'। গুড্‌কে তারা তার চশমা পরা চোখের জন্য 'বাউগওয়ান' (কাঁচ চোখো) বলেই ডাকতো।

আমি আর স্যার হেনরীও সাবাস দিয়ে উঠলাম, 'বাহ্‌বা বাউগওয়ান!' সেই থেকে কাফিরদের মধ্যে ভাল শিকার সন্ধানী বলে গুডের নাম রটে গেলো। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি তার হাতের নিশানা মোটেই ভালো ছিল না। তবে তাক ফস্‌কালে আমরা সবাই এই জিরাফ শিকারের দোহাই দিয়ে তার ত্রুটি ঢাকতাম।

সে-রাতে আগুনের ধারে জিরাফের মাংস আর তার হাড়ের শাঁস মজা করে খেয়ে পূর্ণ চাঁদের আলোয় ধূমপান করতে বসলাম। কিছুক্ষণ বাদেই আমাদের পিছনে বনের মধ্যে থেকে 'হুঁ-উ-ম—হুঁ-উ-ম' স্বরে গভীর গর্জন উঠলো। আমি বলে উঠলাম, 'সিংহের গর্জন!'

সবাই কান খাড়া করে রইলো। কিন্তু সেই গর্জন মেলাতে না মেলাতেই দেখতে পেলাম, আমাদের সামনে প্রায় একশো গজ দূরে, জলার দিকে থেকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ছায়ায় মত সারি সারি হাতীর পাল জঙ্গল অভিমুখে চলেছে।

গুড্ লাফিয়ে উঠলো। চোখেমুখে তার শিকারের তৃষ্ণা জ্বলে উঠলো। সে ভাবলো জিরাফ শিকারের মতন হাতী শিকারও বুঝি খুব সোজা। আমি তক্ষুনি তার হাতটা ধরে ফেললাম এবং টেনে বসিয়ে দিলাম।

স্যার হেনরী কিছুক্ষণ বাদেই বলে উঠলেন, 'আমরা যেন শিকারীর স্বর্গধামে এসে গেছি। আমি বলিকি দু' একদিন এখানে থেকে আমরা এক হাত দেখেই যাই।'

তাঁর কথায় আমি একটু আশ্চর্যই হলাম। ভেবেছিলাম কোথায় তিনি এগিয়ে যাবার জন্য ব্যস্ত হবেন, তা না শিকারে মত্ত হতে চান। যা হোক, শেষে জবাব দিলাম, 'সেইভালো, বোধ হয় আমাদের একটু স্ফুর্তির দরকার কিন্তু সেটা এখন এই মুহূর্তে থাক। কাল ভোরেই আমরা বেরুবো। হাতীর দল চরতে চরতে বেশীদূর যাবার আগেই আমরা ধরে ফেলবো।'

আমার কথায় সকলেই রাজী হলো। পরদিন ভোরের প্রথম আলোতেই তৈরী হয়ে বেরুলাম। সঙ্গে রইলো উম্‌বোপা, খিভা আর ভেন্‌তেভোগেল।

হাতীর দলের দীর্ঘ পদ-চিহ্নাবশেষ খুঁজে বের করতে আমাদের বেশী কষ্টপেতে হলো না। পায়ের দাগ পরীক্ষা করে ভেন্‌তেভোগেল জানালো যে, এ দলে প্রায় বিশ থেকে তিরিশটা মতন হাতী আছে আর এদের মধ্যে বেশীর ভাগই জোয়ান আর মদ্দা। অবিলম্বে হাতীর

দঙ্গল আমাদের নজরে পড়লো। ভেন্‌তেভোগেলের অনুমানই ঠিক। দলে প্রায় বিশ থেকে তিরিশটাই হাতী। সকালের খাওয়া শেষ করে প্রায় দুশো গজ দূরে দাঁড়িয়ে তাদের কুলোর মতন কান নাড়ছিল।

হাওয়া কোন দিকে জানবার জন্যে একমুঠো শুকনো ঘাস নিয়ে আমি বাতাসে উড়িয়ে দিলাম। কারণ আমি জানতাম যে, যদি তারা একবার আমাদের গন্ধ পায়, তাহলে নিশানা নেবার আগেই চম্পট্ দেবে। হাতীদের দিক থেকে বাতাস বইছে দেখে, আমরা গা ঢাকা দিয়ে চুপি চুপি এগিয়ে হাতীর কাছ থেকে প্রায় চল্লিশ গজ দূরে পৌঁছুলাম। দেখতে পেলাম আমাদের ঠিক সামনেই পাশ ফিরে তিনটে বিরাট মদ্দাহাতী দাঁড়িয়ে। একজনের মুখে আবার বিরাট দাঁত। আমি সকলকে ফিস্ ফিস্ করে জানালাম যে, মাঝেরটা আমার, বাঁদিকেরটা স্যার হেনরীর আর বড় দাঁতালো হাতীটা ক্যাপ্‌টেন গুডের। আমি ফিস্ ফিসিয়ে উঠলাম, নিন্—এইবার—'

তিনটে ভারী রাইফেল্ গর্জে উঠলো, বুম্! বুম্! বুম্! স্যার হেনরীর শিকার মরা কাঠের মতন গড়িয়ে পড়লো। গুলীটা তার হৃদপিণ্ড ফুটো করে বেরিয়ে গেছে। আমারটাও হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো। ভাবলাম শেষ হয়ে এসেছে, কিন্তু ব্যাটা উঠে গাছপালা ভেঙ্গে-চুরে আমার পাশ দিয়ে সোজা দৌড় দিল। পাশ দিয়ে যাবার সময় আর একটা গুলি করলাম। এইবারে বাছাধন একেবারে কাত হয়ে পড়লো। তাড়াতাড়ি বন্দুকে দুটো তাজা কার্তুজ ভরে নিয়ে তার খুব কাছে দৌড়ে গেলাম। মাথার খুলি লক্ষ্য করে একটা গুলি চালাতেই জংলীটার দাপাদাপি সব ঠাণ্ডা হয়ে গেলো।

বড় হাতীটাকে নিয়ে গুড্ কতদূর কি করলে দেখবার জন্যে আমি এইবার ঘুরে দাঁড়ালাম। ক্যাপ্‌টেনের কাছে গিয়ে দেখি, তার অবস্থা

সঙ্কটজনক। মনে হলো গুলি খেয়ে হাতীটা ঘুরে দাঁড়িয়ে সোজা তার শত্রু লক্ষ্য করে ছুটে এসেছিল, গুড্ কোন রকমে তার সামনে থেকে পালিয়ে বেঁচেছে। হাতীটা কানার মতন সোজা আমাদের ক্যাম্পের দিকে ছুটে গেছে। ইতোমধ্যে অন্যগুলো দারুণ ভয়ে মড়মড়িয়ে জঙ্গল ভেঙ্গে ছুট্ দিলো বিপরীত দিকে। আমরা আহত হাতীটাকে ছেড়ে তাদের পিছু নেওয়াই ঠিক করলাম। কিন্তু তাদের পিছু ধাওয়া করাটা তত সোজা বোধ হলো না। দু'ঘণ্টার ওপর চাঁদী-ফাটা রোদে ধ্বস্তা-ধ্বস্তি করবার পর তাদের নাগাল পাওয়া গেলো। দেখি একটা ছাড়া সবগুলোই দল বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের অস্থির অবস্থা আর শুঁড়তুলে বাতাস শোঁকা দেখেই বুঝতে পারলাম, তারা বিপদের আশঙ্কা করছে। বলা বাহুল্য দলছাড়া হাতীটা পাহারার কাজে নিযুক্ত ছিল। আরো নিকটে গেলে পাছে সে অন্যগুলোকে সাবধান করে দেয় সেই ভয়ে আমরা প্রায় ষাট গজ দূর থেকে হাতীটাকে নিশানা করলাম। আমার ইশারায় গুলি গর্জে উঠলো। তিনটে গুলি এক লক্ষ্যে গিয়ে বিঁধ্লো আর শিকারও লুটিয়ে পড়লো। দঙ্গলটা আবার ছুট্ মারলো। কিন্তু শতখানেক গজ দূরে ছিল একটা নালা। খাড়াই উচুঁ পাড় তার। দলটা ঝাঁপিয়ে গিয়ে তার মধ্যে পড়লো। আমরা ছুটে গিয়ে দেখি, ওপারে পৌঁছে হাতীগুলো নালার খাড়াই পাড় বেয়ে ওঠবার চেষ্টা করছে। স্থযোগ বুঝে দনাদন্ গুলি চালালাম। পাঁচটা হাতী মারা পড়লো। অন্যগুলি পাড় বেয়ে ওঠার চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে সোজা দৌড় দিলে। তাদের পিছু নেবার মতন আমাদের আর শক্তি ছিল না। তাছাড়া এই হত্যাকাণ্ডও আর ভালো লাগছিল না। একদিনে যথেষ্ঠ হয়েছে দেখে ক্ষান্ত দিলাম।

একটু বিশ্রাম নিয়ে কাফীরদের মাংস কাটার হুকুম দিয়ে ফিরলাম। পথে যে জায়গাটায় গুড্ সেই সর্দার হাতীটাকে জখম করেছিল, সেই জায়গায় একদল কৃষ্ণসার হরিণ আমাদের চোখে পড়লো। কিন্তু যে হেতু আমাদের মাংসের কোনো অভাব ছিল না, তাই আর সেগুলোর দিকে তাগ্ করলাম না। হরিণগুলো আমাদের পিছনে ফেলে লাফাতে লাফাতে ছুট দিলো। প্রায় একশ' গজ দূরে একফালি ঝোপের কাছে গিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে আমাদের দেখতে লাগলো। এত কাছে কৃষ্ণসার হরিণ গুড্ আগে কোনদিন দেখেনি। কাজেই খুব কাছে থেকে তার হরিণ দেখার ইচ্ছা প্রবল হয়ে উঠলো। উম্বোপার হাতে রাইফেলটা দিয়ে সে খিভাকে নিয়ে ঝোপের দিকে এগিয়ে গেলো। আমরা বসে তার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। বলতে লজ্জা নেই কতকটা ক্লান্তির জন্যেও বটে।

দিগন্তে সূর্য তখন তার আরক্তিম গরিমায় অস্ত যেতে বসেছে। স্যার হেনরী আর আমি বসে বসে সেই দৃশ্য উপভোগ করছি। এমন সময় একটা হাতীর তীব্র কর্কশ চীৎকার কানে এলো। ফিরে দেখতে পেলাম একটা বিরাট হাতী তার শুঁড় আর ল্যাজ শূন্যে তুলে, হুঙ্কার দিতে দিতে একটা বিরাট কালো ছায়ার মতন ছুটে আসছে। পর-মুহূর্তেই চোখে পড়লো, গুড্ আর খিভা সেই আহত উন্মত্ত হাতীকে পিছনে রেখে প্রাণপণে দৌড়ে আসছে। পাছে তাদের গায়ে গুলি লাগে, সেই ভয়ে আমাদের গুলি চালাতেও সাহস হলো না। ছুট্তে ছুট্তে আমাদের কাছে থেকে ষাট গজ দূরে এসে শুকনো ঘাসে গুডের মসৃণ জুতো পিছ্লে গেলো, আর সেই অবস্থায় হাতীর সামনে সে সোজা উপুড় হয়ে ছিট্কে পড়লো। আমাদের নিঃশ্বাস রুদ্ধ হয়ে গেলো, বুঝলাম এবার তার স্থির মৃত্যু! প্রাণপণ শক্তিতে আমরা গুডের দিকে

দৌড়লাম। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই সব শেষ হয়ে যাবার কথা কিন্তু ঘটলো আর একরকম। খিভা নামে সেই জুলু ছেলেটি গুড্‌কে পড়তে দেখে, ঘুরে দাঁড়িয়ে তার হাতবর্ষাটা সোজা হাতীর মুখে ছুঁড়ে মারলে। বর্ষাটাও হাতীর দাঁতের গোড়ায় ফ্যাস করে বিঁধে গেলো।

যন্ত্রনায় চীৎকার করতে করতে জংলী জানোয়ারটা খিভাকে শুঁড় দিয়ে তুলে নিয়ে মাটিতে আছাড় মারলে। তারপর তার একটা বিরাট পা খিভার দেহের ওপর রেখে, শুঁড় দিয়ে তার বুক পিঠ পাকিয়ে ধরে ধড়টাকে দু-আধখানা করে টেনে ছিঁড়ে ফেলে দিলো।

ভয়ে আমরা উন্মত্ত হয়ে গুলির পর গুলি চালাতে লাগলাম। হাতীটা ঘুরে খিভার অবশিষ্ট দেহের ওপর কাত হয়ে পড়লো।

সমস্ত দৃশ্যটা দেখে অন্যের কথা দূরে থাকুক, আমার মতন পাকা শিকারীরও গলা দিয়ে কোন আওয়াজ বেরুলো না। শুধু উমবোপা বলে উঠলো, "হ্যাঁ বেশ মরেছে—মরদের মত জান দিয়ে মরেছে!"

মরুপথে

শিকারে সবশুদ্ধ ন'টা হাতী আমাদের মিললো। তাদের দাঁতগুলো কাটতেই দু'দিন কেটে গেলো; সেগুলোকে বালির মধ্যে পুতে ফেললাম। প্রকাণ্ড একটা গাছকে ভবিষ্যতের চিহ্ন করে রাখা হলো।

খিভার দেহের যেটুকু অবশিষ্ঠ ছিল সেটুকু নিয়েই আমরা তাকে উইঢিপির মধ্যে কবর দিলাম। সেই সঙ্গে স্বর্গের যাত্রাপথে আত্মরক্ষার অস্ত্র হিসাবে তার হাত বর্ষাটাও দিয়ে দেওয়া হলো।

তারপর তৃতীয় দিনে আবার যাত্রা সুরু করলাম। মার্চ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ডারবান থেকে হাজার মাইল পথ পাড়ি দিয়ে লুকাঙ্গা নদীর ধারে সিতান্দা বলে এক গাঁয়ে এসে পৌঁছুলাম। এইখান থেকেই আমাদের আসল অভিযান সুরু হবার কথা। জায়গাটার কথা আমার বেশ মনে আছে। ডান দিকে স্থানীয় লোকদের ছাড়া ছাড়া বাড়ীঘর। পাশে পাশে লাগোয়া পাথুরে গোয়াল। নদীর ঢালে ক্ষেত। ছিটে ফোঁটা ফসল হয়। তারপরই লম্বা লম্বা ঘাসের বন আর বাঁদিকে দিগন্ত বিস্তৃত মরুভূমি।

যখন আমরা এখানে পৌঁছুলাম, রঙবেরঙের আলো ছাড়িয়ে মরুভূমির পারে তখন সূর্য অস্ত যেতে বসেছে। গুড্‌কে শিবিরের কাজে নিযুক্ত করে স্যার হেনরীকে সঙ্গে নিয়ে আমি একটা ঢালু ঢিবির ওপর গিয়ে দাঁড়ালাম। আমাদের ঠিক বিপরীতে মরুভূমির দিকে

আমরা তাকিয়ে দেখতে লাগলাম। পরিষ্কার আকাশ। দূর-দিগন্তে সুলেমান পর্বতের নীল রেখার মাথায় এখানে ওখানে সাদা বরফের চূড়া স্পস্ট আমার চেখে পড়লো।

"ঐ—ঐ ওখানেই হলো সম্রাট সলোমনের ধনভাণ্ডারের দেউল।" আমি বললাম, "তবে কোনদিন আমরা ওখানে পৌছুতে পারবো কিনা, তা একমাত্র ঈশ্বরই জানেন।"

স্যার হেনরী তাঁর আত্মবিশ্বাস-পূর্ণ ধীর গলায় জবাব দিলেন, "আমার ভাইটি বোধ হয় রয়েছে ওখানে, যদি সে থাকে তবে আমাকে যে করে হোক পৌছুতে হবেই।"

"আমিও সেই রকমটাই আশা করছি", বলে ঘুরে ক্যাম্পের দিকে ফিরতে যাচ্ছি, তখন দেখলাম সেখানে আমরা দু'জন ছাড়াও আমাদের পিছনে আর একজন দাঁড়িয়ে সেই দিগন্ত পারের পাহাড়ের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে আছে। লোকটাকে চিন্‌লাম। সেই দীর্ঘকায় কাফির, উম্‌বোপা।

তাকে আমি দেখতে পেয়েছি দেখে সে মুখ খুললো। তবে আমাকে কিছু না বলে স্যার হেনরীকে উদ্দেশ্য করে বল্লো, "আপনি কি ঐ দেশে যাবেন?"

স্যার হেন্‌রী উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ ঐ দেশের দিকেই আমি যাবো উম্‌বোপা।"

"সামনে রয়েছে ধূ-ধূ মরুভূমি, এর মধ্যে পাবেন না কোথাও আপনি এক ফোঁটা জল। আর ওদিকেও আছে বিরাট উঁচু উঁচু পাহাড়—তুষারে ঢাকা। এদের পেছনে অস্তগামী সূর্যের দেশে কি আছে মানুষে তা বলতে পারে না। আপনি সেখানে যাবেন কি করে হুজুর—আর কেনই বা যাবেন?" উম্‌বোপা, প্রশ্ন করে উঠলো।

আমি সমস্ত কথাটা অনুবাদ করে দিলাম। স্যার হেন্‌রী আমাকে বললেন, "ওকে বলুন আমার বিশ্বাস যে, আমার ভাই ওদেশে গেছে তাকে আমার খুঁজে বের করতেই হবে।"

"অনেক দূরের রাস্তা ইনকুবু", (দেশী ভাষায় অর্থ, হাতী। কাফিররা স্যার হেন্‌রীকে তাঁর বিক্রমের জন্য নিজেদের মধ্যে ঐ নামে ডাকতো।) সে মন্তব্য করলো। আমিও অনুবাদ করে স্যার হেন্‌রীকে জানালাম।

"হ্যাঁ" স্যার হেনরী জবাব দিলেন, "অনেক দূরের পথ বটে; কিন্তু মানুষ যদি স্থির প্রতিজ্ঞ হয়, তবে পৃথিবীতে এমন কোন পথ নেই যা সে অতিক্রম করতে না পারে।"

আমি অনুবাদ করে জানালাম।

"কথার মতন কথা বলেছেন" জুলুটা উত্তর করলো—উম্‌বোপা জাতে জুলু না হলেও আমি সব সময় ওকে জুলুই বলতাম। "মানুষতো মরবেই ইনকুবু, একটু আগে বা পরে এই যা। আমি যাবো। বালির সাগর পেরিয়ে, পাহাড় ডিঙ্গিয়ে আমরণ আপনার চলার সাথী হবো।"

জুলুরা যেমন মাঝে মাঝে উচ্ছ্বাসে ভরে ওঠে, উম্‌বোপা তেমনি উচ্ছসিত হয়ে উঠলো। থামলে পরে স্যার হেনরী বলে উঠলেন, "লোকটা ভারী অদ্ভুত তো!"

উম্‌বোপা হেসে উঠলো, "আমার মনে হয় ইনকুবু আমরা দু'জনে এক। এমন তো হতে পারে যে ঐ পাহাড়ের পারে আমিও আমার এক ভাইকে খুঁজে বেড়াচ্ছি।"

আমি তার দিকে সন্দেহ পূর্ণ দৃষ্টি ফেললাম। প্রশ্ন করলাম, "তার মানে কি? ঐ পাহাড়ের কথা তুই কি জানিস?"

"খুব সামান্যই জানি। আমাদের সামনে আছে একদেশ—সে দেশ ডাইনীর দেশ। সে দেশ বীরের দেশ—সে দেশ তরুলতা, নদী, তুষার-শৃঙ্গপর্বত আর মস্ত এক সাদা রাস্তার দেশ। সে দেশ সম্বন্ধে এই সব কথাই আমি শুনেছি। যাক সে সব কথায় কাজ কি? যারা সে সব দেখবার জন্যে বেঁচে থাকবে তারাই দেখবে!"

ওর দিকে আমি আবার সন্দেহপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালাম। লোকটা অনেক কিছু জানে মনে হলো।

আমার দৃষ্টির অর্থ বুঝে সে বলে উঠলো, "মাকুমাজাহান্ আমাকে ভয় করবার কিছু নেই। আপনাদের বিপদে ফেলার জন্যে পথে আমি কোন গোপন ফাঁদ পেতে রাখিনি। যদি কোনদিন আমরা ঐ পাহাড় পেরিয়ে যেতে পারি তবেই বলবো আমি যা জানি। কিন্তু একথা জেনে রাখুন, স্বয়ং যম ওখানে বসে আছে, তাই বলি এখনও ভেবে দেখুন ও ফিরে যান।"

আর বেশী কথা না বলে সে তার বর্ষা তুলে সেলাম জানিয়ে ক্যাম্পের দিকে ফিরে গেলো।

পরদিন আমাদের যাত্রার ব্যবস্থা স্থির করে ফেললাম। এবার সঙ্গে অতি প্রয়োজনীয় জিনিষ ছাড়া আর কিছুই রাখা হলো না। অনেক কষ্টে উৎকৃষ্ট শিকার করা ছুরির লোভ দেখিয়ে তিনজন গেঁয়ো কুলিকে আমাদের কয়েকটা জল ভর্তি বড় বড় লাউয়ের খোল প্রথম কুড়ি মাইল বয়ে নিয়ে যেতে রাজী করলাম। আমার উদ্দেশ্য ছিল যে, প্রথম রাত চলার পর যাতে আমাদের জলের বোতলগুলো আবার পূর্ণ করে নেওয়া যায় তারই ব্যবস্থা রাখা। কারণ আমরা ঠিক করেছিলাম রাতে ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় যাবো।

পরের সারাটা দিন আমরা ঘুমিয়ে-টুমিয়ে বিশ্রাম করলাম। সন্ধ্যায় খাওয়া দাওয়ার পর তৈরী হয়ে চাঁদ ওঠার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। রাত ন'টায় চাঁদ উঠলো। আমাদের সামনে বিস্তীর্ণ মরুভূমিতে রূপালী আলোর ঝলক্ খেলে গেলো। নক্ষত্র খচিত নীল আকাশের মতই মরুভূমি রহস্যময় হয়ে উঠলো। আমরা উঠে দাঁড়ালাম এবং পা বাড়াবার জন্যে মুহূর্তের মধ্যে তৈরী হয়ে গেলাম। যাবার আগে স্যার হেনরী সর্বনিয়ন্তা ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করলেন, তারপর হুকুম দিলেন, "আগে বাড়ো।"

সুদূর পর্বতমালা আর জোসে সিলভেস্ত্রের সেই বিবরণ ছাড়া পথনির্দেশসূচক কোন বস্তুই আমাদের কাছে ছিল না। তিন'শ বছর আগে একটুকরো ছেঁড়া কাপড়ের ওপর এক মৃত্যু-পথ যাত্রীর লেখার কোন মূল্য থাকতে পারে বলে মনে হলো না আমার। তবু ঐটাই আমাদের ছিল একমাত্র আশা-ভরসা। যদি বিবরণ মত চলার পথে, মাঝ মরুতে অপেয় জলের ডোবাটা না পাই, তবে সম্ভবত তৃষ্ণাতেই আমরা মারা যাবো। সব দেখে মনে হতে লাগলো সেই বালির সমুদ্র ও কারু ঝোপের মাঝে সেটা খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা অতি ক্ষীণ। যদি ধরেও নেওয়া যায় যে, সিলভেস্ত্রের বিবরণ ঠিক, তবু সেটা এতদিন যে শুকিয়ে যায়নি বা জন্তুজানোয়ারের পায়ের তলায় ধ্বংস হয়ে যায়নি কিংবা উড়ন্ত বালিতে বুজে যায়নি, তারই বা নিশ্চয়তা কি!

আমরা নিঃশব্দে সে রাত্রে ছায়ার মতন ভরা বালির ওপর দিয়ে চলতে লাগলাম। কারু ঘাসের ঝোপে আমাদের পা আটকে যেতে লাগলো আমাদের জুতোর মধ্যে বালি ঢুকে এমন বাধার সৃষ্টি করতে লাগলো যে, প্রায় কয়েক মাইল গিয়েই আমাদের থেমে থেমে সেগুলো পরিষ্কার করতে হচ্ছিল। এরপর আমরা অনেকটা পথ বেশ ভালো

ভাবেই এগিয়ে চললাম। রাত একটার সময় থামবার হুকুম পেলাম। এবার অল্প একটু জল খেয়ে নিলাম। অল্প একটু—কারণ জল তখন আমাদের কাছে বহুমূল্য সামগ্রী হয়ে উঠেছে। আধ ঘণ্টা বিশ্রামের পর আবার হাঁটতে সুরু করলাম।

চলেছি তো চলেছি। কতটা পথ চলেছি তার হুঁস নেই। অবশেষে দেখলাম, আমাদের সামনে পূবের আকাশে লালচে রঙ ধরলো। ঈষৎ গোলাপী আভায় দিগন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠলো এবং দেখতে দেখতে সোনালী আলোয় ভোরের মরুভূমি ভরে গেলো।

আমরা চলতে লাগলাম। যদিও বিশ্রাম নেবার ইচ্ছে মনে মনে প্রবল হয়ে উঠেছিল কিন্তু তবু আমরা থামলাম না। কারণ জানতাম যে, সূর্যের তেজ একবার বাড়তে সুরু করলে পথ চলা একেবারেই অসম্ভব হয়ে উঠবে। ঘণ্টা খানেক চলার পর, দূরে কতগুলো খাড়া খাড়া পাথর দেখতে পেয়ে সেদিকেই আমরা টলতে টলতে চললাম। আমাদের জোর বরাত বলতে হবে। কারণ, সেখানে গিয়ে দেখলাম, মাথার ওপর ছাতের মতন হয়ে এক এক পাথর ঝুলছে আর তার তলায় বিছনো রয়েছে বালির মস্‌ন কার্পেট। প্রচণ্ড রোদের হাত থেকে বাঁচবার মতন একটা আশ্রয় জুটে গেলো। ওরই তলায় আমরা কোন রকমে গুড়িসুড়ি মেরে ঢুকে পড়লাম। পেটে একটু কিছু দিয়ে খানিকটা জল খেয়ে গভীর ঘুমে অচেতন হ'য়ে পড়লাম সবাই।

যখন ঘুম ভাঙ্গলো তখন দেখি ঘড়িতে তিনটে বাজে। উঠে দেখলাম আমাদেয় কুলিগুলো পালাবার উপক্রম করছে। মরুভূমিতে আসার সখ তাদের মিটে গেছে। হাজার খানা ছুরি দিলেও তারা আর এক পা এগুতে রাজী নয়। ভালোই হলো আমরা প্রাণ খুলে জল খেলাম। তারপর সেই লাউয়ের খোলগুলো থেকে জল ঢেলে নিয়ে আমাদের

জলের বোতল গুলো সব ভরে নিলাম। লোকগুলোও ফেরার পথে রওনা হলো।

সাড়ে চারটার সময় আমরাও আবার চলতে সুরু করলাম। পথ ভারী নির্জন আর একঘেয়ে লাগতে লাগলো। কয়েকটা উটপাখী ও দুটো ভীষণাকৃতি কেউটে ছাড়া, সেই বিস্তৃত মরুভূমিতে আর কোন জন্তু-জানোয়ারেরই সন্ধান পেলাম না। তবে হ্যাঁ, একটা প্রাণী চোখে পড়লো বেশ ভালো করেই, সে আর কিছুই নয়—মাছি। একটা আধটা নয়, ঝাঁকের পর ঝাঁক।

সূর্যাস্তের পর আমরা চাঁদ ওঠবার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম। চিরকালের সেই অপরূপ রূপালী আলো নিয়ে পুরানো চাঁদ মরুভূমিতে নতুন করে দেখা দিলো। সারা রাত ধরে আমরা চললাম। কেবল রাত দুটোর সময় একবার একটু বিশ্রাম নিলাম, তারপর সূর্য না ওঠা পর্যন্ত আর থামা হলো না। খানিকটা করে জল খেয়ে বালির ওপর আমরা এলিয়ে পড়লাম। ঘুমে আমাদের চোখ জড়িয়ে এলো। জন-প্রাণীশূন্য প্রান্তরে নির্ভয়ে নিদ্রা দিলাম। কিন্তু এবারে সূর্যের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার মতন মাথার ওপর পাথর আমাদের ছিল না, কাজেই সাতটা না বাজতে বাজতেই সমস্ত শরীরে ঝল্‌সানো জ্বালা অনুভব করে ঘুম ভেঙ্গে গেলো। জ্বলন্ত সূর্য যেন আমাদের রক্ত শুষে নিতে লাগলো। আমরা উঠে বসে হাঁফাতে লাগলাম। শুধু তাই নয় এদিকে আবার মাছির জ্বালায় অস্থির হয়ে পড়লাম।

স্যার হেনরী বল্‌লেন, "কি করা যায় এখন? এরকম ভাবে তো আর বেশীক্ষণ থাকা যাবে না।"

"আমার মাথায় একটা মতলব এসেছে," গুড্‌ বলে উঠলো। "মাটিতে গর্ত খুঁড়ে কারু ঝোপ ঢাকা দিয়ে পড়ে থাকি না কেন?"

যদিও মতলবটা কারুর তেমন মনঃপুত হলো না, তবু 'নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো' বিবেচনা করে, আমরা কাজে লেগে গেলাম। আমাদের সঙ্গে কর্ণিকের মতন যে যন্তর ছিলো, তাই দিয়ে আর হাতের সাহায্যে ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই, দু'ফুট গভীর আর লম্বা চওড়ায় দশ-বারো ফুটের মতন একটা গাড্ডা খুঁড়ে ফেললাম। তারপর কিছু ঘাস ঝোপ কেটে নিয়ে গর্তের মধ্যে ঢাকা দিয়ে বসলাম। আগুনের হাত থেকে কথঞ্চিৎ রেহাই পাওয়া গেলো বটে, কিন্তু আপন হাতে কাটা সেই সখের কবরে আমাদের অবস্থা হয়ে উঠলো অবর্ণনীয়।

প্রায় তিনটে পর্যন্ত এইভাবে কাটলো তারপর অসহ্য হয়ে উঠলো। অসহ্য গরম আর তৃষ্ণায় সেই গর্তে হাঁফিয়ে মরার চেয়ে চলতে চলতে মরা ঢের ভালো বলেই আমাদের মনে হলো।

ওদিকে আমাদের বোতলের জল ক্রমশঃই দ্রুত শূন্য হয়ে আসছিল। যাহোক মানুষের রক্তের মতন উত্তপ্ত হয়ে ওঠা সেই জলে কোন রকমে গলা ভিজিয়ে আমরা টল্‌তে টল্‌তে এগিয়ে চল্‌লাম।

সারাটা বিকেল ধরে আমরা ধীরে ধীরে হেঁচ্‌ড়ে হেঁচ্‌ড়ে চললাম। ঘণ্টায় কোন রকমে দেড় মাইলের বেশী চলার আমাদের শক্তি ছিল না। সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে আমরা চাঁদের জন্যে থামলাম। সেই ফাঁকে কিছুটা তৃষ্ণা নিবারণ করে সামান্য একটু ঘুমিয়েও নিলাম!

চাঁদ উঠলে আবার যাত্রা সুরু হলো। তৃষ্ণায় আর ঘামাচির ব্যথায় আমাদের প্রায় মরার মতন অবস্থা তখন। এ যন্ত্রনা যে কেমন তা ভুক্তভোগী ছাড়া আর কাউকে বলে বোঝাবার ক্ষমতা আমার নেই। আমাদের হাঁটারও আর শক্তি ছিল না। প্রতি পদক্ষেপে টলে পড়তে লাগলাম।

রাত প্রায় দু'টোর সময় আমরা অর্দ্ধমৃত অবস্থায় একটা অদ্ভুত রকম পাহাড়ের তলায় এলাম। দূর থেকে সেটাকে উইঢিবির মতন দেখাচ্ছিল। কাছে এসে দেখলাম প্রায় বিঘে দুই জমির ওপর এক'শ ফুট উঁচু একটা জমাট বালির পাহাড় সেটা। এখানেই আমরা থামলাম তৃষ্ণায় পাগলের মতন হয়ে সেখানে বোতলের শেষ ফোঁটাটুকু শুষে ফেলে দিলাম। আমাদের তৃষ্ণার কাছে সেই জল সমুদ্রে শিশির বিন্দুবৎ লাগলো।

তারপর আমরা শুয়ে পড়লাম। চোখ বুজে আসার আগে কানে এলো, উমবোপা নিজের মনে বিড় বিড় করছে, "জলের যদি কিনারা না হয়, তবে কাল চাঁদ ওঠার আগেই সবাই মরবো।"

এইরূপ ভয়াবহ আসন্ন মৃত্যুর সংবাদ কোনদিনই ভালো লাগে না ঠিক, কিন্তু সে চিন্তাও তখন আমাদের ঘুমকে রুখতে পারলো না।

জল! জল!

প্রায় ঘণ্টা দুয়েক পর আমার ঘুম ভেঙ্গে গেলো। শারিরীক ক্লান্তি ও তৃষ্ণার তীব্রতা কিছুটা প্রশমিত হবার পর আর শুয়ে থাকতে পারলাম না। উমবোপার কথা মনে পড়ে গেলো—আজ যদি জল না পাওয়া যায় তবে নির্মমভাবে আমাদের নিশ্চিত মৃত্যু ঘনিয়ে আসবে। সেই দুঃসহ উত্তাপে মানুষ বাঁচতে পারে বলে বোধ হলো না। উঠে বসে আমি শুকনো খড়খড়ে হাতে আমার মলিন মুখ ঘষতে লাগলাম। দুই ঠোঁট ও চোখের পাতা জুড়ে এক হয়ে গেছে মনে হলো, কিছুক্ষণ রগড়াবার পর বেশ চেষ্টা করেই তাদের বিচ্ছিন্ন করতে হলো। তখন ভোর হতে যদিও বেশী দেরী ছিল না। কিন্তু বাতাসে তার আমেজটুকুও ছিল না। সর্বত্র একটা কেমন ভ্যাপ্সা গরম আবহাওয়া। সঙ্গীরা সবাই জেগে উঠলে আমরা ভবিষ্যৎ কঠিন সমস্যার কথা আলোচনা করতে বসলাম। এক ফোঁটা জলও আর আমাদের কাছে ছিল না। আমরা জলের বোতলগুলো উপুড় করে বোতলের মুখে জিব লাগালাম। কিন্তু কোনও ফল পাওয়া গেলো না —সব শুকিয়ে একেবারে কেঠো হাড় হয়ে গেছে।

স্যার হেনরী বললেন, "জল যদি না পাই তাহলে তো আমাদের মরণ দেখ্‌ছি।"

"বুড়ো সিলভেস্ত্রের ম্যাপের কথায় যদি আমাদের বিশ্বাস রাখতে হয়," আমি জবাব দিলাম, "তাহলে কাছাকাছি জল নিশ্চয়ই কোথাও থাকা উচিত।"

কিন্তু আমার কথায় কেউ আশ্বস্ত হয়েছে বলে বোধ হলো না। চারদিকের অবস্থা দেখে ম্যাপের ওপর বিশ্বাস রাখার মতন ধৈর্য তখন কারুর ছিলনা। ভোরের আলোয় আমরা পরস্পরের দিকে হাঁ করে চেয়ে রইলাম। আকস্মাৎ আমার নজরে পড়লো, হটেন্টট্ ভেন্‌তে-ভোগেল উঠে মাটির ওপর নজর রেখে হাঁটছে। খানিকটা গিয়েই থেমে, মাটি দেখিয়ে সে অদ্ভুত শব্দ করে উঠলো।

"কি কি ?" করে আমরা প্রায় একসঙ্গে উঠে, যেখানে সে মাটির দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিল সেখানে গিয়ে হাজির হলাম।

"আরে এতো স্প্রিংবক হরিণের পায়ের তাজা ছাপ, এতে চেঁচামেচির কি আছে ?"

সে জবাব দিলো, "এ জাতের হরিণরা তো জল ছেড়ে বেশী দূরে থাকে না।"

"তাইতো! এ কথা আমার মনেই ছিল না।"

এই সামান্য আবিষ্কার আমাদের মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করলো। সত্যি, অতি বিপদে মানুষ যখন একটুখানি আশার আলো দেখতে পায় তখন সে যে কতো খুসি হয় তা ভাবলেও আশ্চর্য হয়ে যাই।

ইতোমধ্যে ভেন্‌তেভোগেল তার থ্যাবড়া নাকটা আকাশে তুলে বুড়ো ভেড়ার মতন উষ্ণ বাতাস শুঁকতে শুঁকতে বলে উঠলো "জলের গন্ধ আমার নাকে আসছে।"

আমি রেগে বলে উঠলাম, "বোকা মেড়া কোথাকার! এখানে কোথাও জলের নাম গন্ধও নেই অথচ ওনার নাকে জলের গন্ধ আসছে।"

তবুও সে কিন্তু তার কদাকার নাক তুলে বাতাস শুঁকতে লাগলো।

"নাকে আমি গন্ধ পাচ্ছি, হুজুর!" সে উত্তর দিলো, "শূণ্যে কোথাও জল আছে মনে হচ্ছে।"

আমি বল্লাম, "হ্যাঁ, আকাশের মেঘে জল আছে সন্দেহ নেই, তবে দু'মাস বাদে আমাদের হাড় ক'খানা ধুয়ে দিতেই নামবে সে জল!"

স্যার হেনরী তাঁর হল্‌দে দাড়ীতে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, "হয়তো পাহাড়ের মাথাতেও জল থাকতে পারে।"

গুড্ বলে উঠলো, "হ্যাঁ! পাহাড়ের মাথায় আবার কোনদিন জল থাকে না কি!"

আমি বললাম, "আচ্ছা দেখাই যাক না কেন?" তারপর বেশ অনিচ্ছার সঙ্গেই ঢিবিটার বেলে গা বেয়ে আমরা উপরে উঠতে লাগলাম। উম্‌বোপা পথ দেখিয়ে উঠতে লাগলো। খানিকটা গিয়েই সে যেন ভয় পেয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো। তারপর হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলো, "নান্‌জিয়া মান্‌জি—জল—এখানে জল!"

আমরা তাড়াতাড়ি তার কাছে গিয়ে দেখলাম সত্যিই সেই বেলে পাহাড়টার চ্যাটালো মাথায় একটা গভীর খোঁদলের মধ্যে জল জমে রয়েছে। এখানে এমনভাবে কোথা থেকে জল এলো? এ জল পরিষ্কার কি অপরিষ্কার, সে সব চিন্তা করবার ধৈর্য আমাদের ছিল না। তখন আমাদের জল বা ঐ জাতীয় কিছু হলেই হলো। মুহূর্তের মধ্যে আমরা উপুড় হয়ে পড়ে সেই কালো ময়লা জলে মুখ লাগালাম। আমাদের সে জল দেবভোগ্য অমৃতের মতন লাগতে লাগলো। প্রাণভরে জল খাবার পর আমরা গায়ের জামা কাপড় খুলে জলে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। শুকনো চামড়া জলের শীতল পরশ শুষে নিতে লাগলো।

শরীর বেশ স্নিগ্ধ হলে আমরা জল থেকে উঠে, সঙ্গে আনা শুকনো মাংস বেশ পেট ভরে খেলাম। গত চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে পেটে কিছু না পড়াতে খিদেটাও ছিল জবর।

সারাটা দিন আমরা জলার ধারে ঘুমিয়ে, বসে বিশ্রাম করলাম। জল পাওয়ার জন্যে ভাগ্যদেবীকে অজস্র ধন্যবাদ তো দিলামই, এমন কি মৃত সিলভেস্ত্রেকেও ধন্যবাদ দিতে ভুললাম না। চাঁদ ওঠার সাথে সাথেই জলের বোতল ও সেই সঙ্গে নিজেদের পেটগুলোও জলে বোঝাই করে যাত্রা করলাম।

এবার শরীর ও মন সকলেরই বেশ তাজা, কাজেই একরাতে পঁচিশ মাইল পাড়ি দিলাম। বলা বাহুল্য পথে কোথায় জলের চিহ্নও দেখলাম না। তবে সৌভাগ্য বশতঃ পরদিন দিনমানে কতকগুলি উইঢিবির পাশে আশ্রয় নেবার মত ছায়া মিললো। সূর্য উঠে কিছুক্ষণের জন্য কুয়াশা কেটে গেলে দেখতে পেলাম, আমাদের ঠিক সামনে মাথার ওপর প্রায় বিশ মাইল মাত্র দূরে, সুলেমান পর্বতমালার দুই চূড়া মাথা উঁচু করে খাড়া হয়ে রয়েছে। পরদিন ভোর হবার সাথে সাথে আমরা সেবা পাহাড়ের বাঁ দিকের খাড়াই পথ ধরলাম। আমাদের কাছে জলের লেশ মাত্রও অবশিষ্ট ছিল না। কিন্তু তৃষ্ণায় আকণ্ঠ শুকিয়ে উঠছিল। মাথার ওপর তুষার রেখায় না পৌঁছানো পর্যন্ত জল পাবার কোন আশাই আছে বলে মনে হলো না।

ঘণ্টা কয়েক বিশ্রাম নেবার পর যন্ত্রণা-দায়ক তৃষ্ণা নিয়ে, জমাট-লাভায় তৈরী উত্তপ্ত পাথরের উপর দিয়ে পা-গুলোকে কোন রকমে আমরা টেনে নিয়ে চল্‌লাম। বেলা এগারটা নাগাদ আমাদের অবস্থা এক্কেবারে কাহিল হয়ে পড়লো। জমাট বাঁধা ঝামার মত লাভার ওপর দিয়ে চলতে চলতে পা কেটে কেটে যেতে লাগলো, তার ওপর পথে অন্ত

কষ্ট তো ছিলই—সব মিলে আমাদের প্রায় অন্তিম অবস্থায় নিয়ে ফেললো। কয়েকশ' গজ দূরে মাথার ওপর একটা বড় গোছের ঝামা-পাথরের ছায়ার নীচে আশ্রয় নেবো বলে কোন রকমে সেই দিকে উঠতে লাগলাম। সেখানে পৌঁছে নিকটেই একটা সমতল জায়গায় বেশ খানিকটা ঘন সবুজ ঝোপের চিহ্ন চোখে পড়লো। কিন্তু আমরা সেদিকে তেমন মন দিলাম না। পাথরের ধারে বসে ধুঁকতে লাগলাম। ঐ অবস্থায় নজরে পড়লো উম্‌বোপা লাফাতে লাফাতে ঝোপের দিকে চলেছে। কয়েক মিনিট বাদেই দেখি, উম্‌বোপার মতন ভারিক্কে লোক সঙয়ের মতন চীৎকার করে নাচতে সুরু করে দিয়েছে। সেই অবস্থায় আমাদের শরীরে যেটুকু শক্তি ছিল তাই দিয়ে কোন রকমে ধুঁক্‌তে ধুঁকতে ওর দিকে এগুলাম। মনে আশা বোধ হয় ও জল দেখতে পেয়েছে। আমি জুলু ভাষায় চীৎকার করে জিজ্ঞাসা করলাম, "কিরে কি হতভাগা ?"

"ভাত জল হুই-ই—মাকুমাজাহন্।" বলে সে একটা সবুজ জিনিস নাড়তে লাগলো।

তখন বুঝতে পারলাম বস্তুটা কি। একটা তরমুজ। দেখলাম আমরা এক ফালি বুনো তরমুজ ক্ষেতে এসে পড়েছি। গাছে হাজারে হাজারে তরমুজ ফলে রয়েছে।

পাশে গুড্‌কে চেঁচিয়ে বল্‌লাম, "দাদা তরমুজ!" বলার পর-মুহূর্তেই দেখি, সে এক তরমুজের গায় তার বাঁধানো দন্তপাটি বসিয়ে দিয়েছে।

আমরা প্রায় গোটা পাঁচ-ছয় তরমুজ খেয়ে তৃষ্ণা নিবারণ করলাম। যদিও তরমুজ এমন কিছু পুষ্টিকর খাদ্য নয় তবুও ইতোমধ্যে আমাদের বেশ খিদে পেয়ে গেলো। কাছে শুকনো মাংস থাকলেও সেগুলো আর

গিলতে ইচ্ছে করছিল না। তাছাড়া ভবিষ্যতের চিন্তা তো ছিলই। ঠিক এই সময় দৈব বলেই এক ঘটনা ঘটে গেলো। মরুভূমির দিকে তাকিয়ে দেখি প্রায় দশটা বিরাট বিরাট পাখী ঝাঁক বেঁধে আমাদের দিকে উঠে আসছে।

ভেন্তেভোগেল ফিস্‌ফিসিয়ে বলে উঠলো, "স্কিত্‌, রাআস্ স্কিত্‌!" অর্থাৎ "মারুন, হুজুর মারুন" বলেই সে সটান উপুড় হয়ে মাটিতে শুয়ে পড়লো। তার দেখাদেখি আমরাও সঙ্গে সঙ্গে মাটি নিলাম।

তারপর চেয়ে দেখি কি, এক ঝাঁকে দশটা বিরাট উঠপাখীর মতন পাখী মাথার প্রায় পঞ্চাশ গজ ওপর দিয়ে উড়ে আসছে। পিস্তলটা বাগিয়ে ধরে অপেক্ষা করতে লাগলাম। আমাদের মাথার ওপর আসা মাত্রই আমি লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। আমাকে দেখা মাত্রই পাখীর ঝাঁকটা জোট বেঁধে উড়তে লাগলো। আমি এইটেই চাইছিলাম। তাদের জোট বাঁধা ঝাঁকে সোজা হু'টো গুলি চালিয়ে দিলাম। বরাত জোরে একটা ঘুরে পড়লো আর অন্যগুলো চম্পট দিলো। দশ সের ওজনের পাখীটা বেশ ভালোই ছিলো। আধ ঘণ্টার মধ্যে আমরা তরমুজের শুকনো লতাপাতা দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে রোস্ট বানাতে বসে গেলাম। খাওয়া দাওয়ার পর দেখা গেল পাখীটার ঠ্যাং আর ঠোঁট ছাড়া আমরা সবই শেষ করে দিয়েছি।

সেই রাতে আবার আমরা চলতে সুরু করলাম। এবার আর জলের কষ্ট নেই। সঙ্গে যতগুলো পারি তরমুজ বয়ে নিয়ে চলেছি। যতই উঁচুতে উঠতে লাগলাম বাতাস ঠাণ্ডা হয়ে আসতে লাগলো। সকাল বেলা মনে হলো তুষার রেখা থেকে আমরা প্রায় মাইল বারো দূরে রয়েছি। এখানে আরো তরমুজের ক্ষেত নজরে পড়লো। জলের

জন্য আর উদ্বিগ্ন নই। কারণ বুঝতে পারলাম অল্পক্ষণের মধ্যেই আমাদের রাশ রাশ তুষারের মধ্যে পড়তে হবে। কিন্তু পথ এতো খাড়াই হয়ে উঠলো যে, উচুঁতে উঠতে বেশ কষ্ট হতে লাগলো। ঘণ্টায় মাইলের বেশী এগুনো অসম্ভব হয়ে উঠলো।

সেই রাতে আমাদের শুকনো মাংসের অবশিষ্ট সম্বলটুকুও আর রইলো না। পাখীর ঝাঁক ছাড়া কোন জীবন্ত প্রাণীও আর এপথে চোখে পড়লো না। এমন কি এই তুষার মালার কাছে এসেও কোন ঝরণা বা জলাশয় চোখে না পড়াতে অদ্ভূত লাগলো। কাজেই এবারে খাবারের জন্য বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলাম। তার পরের তিন দিন যে কি অবর্ণনীয় কষ্টের মধ্য দিয়ে কাটলো তা আমার ডাইরীর পাতা খুললেই বেশ ভালো বোঝা যাবে।

"২১শে মে—যাত্রা, সকাল ১১টা। শীতে দিনেও হাঁটতে বেশ কষ্ট হয়। সমস্ত দিন পথ চলেছি পথে আর তরমুজ মেলে নি। পেটে কিছু পড়েনি বলে সূর্যাস্তের পর রাত্রে বিশ্রাম। শীতে রাতে অসহ্য কষ্ট পেয়েছি।

"২২শে মে—বেশ কড়া রোদ উঠে একটু শীত ভাঙলে এগুতে আরম্ভ করলাম। আমাদের অবস্থা সঙ্কটজনক। খাবার না পেলে এই যাত্রাই আমাদের শেষ। স্যার হেনরী, গুড্ ও উম্‌বোপা যুঝে চলেছে কিন্তু ভেন্‌তেভোগেলের অবস্থা কাহিল। একদম শীত সহ্য করতে পারেনা। খিদে আছে কিন্তু পাকস্থলী কোন সাড়া দেয় না। সবারই এক অবস্থা। আমরা একটা খাড়াই লাভার দেওয়াল ধরে চলেছি। এই পথটাই পর্বতের দুই মাথাকে এক করেছে। প্রাকৃতিক দৃশ্য চমৎকার। কোন জীবিত প্রাণীর সাক্ষাৎ পাইনি। মৃত্যু ঘনিয়ে আসছে।

"২৩শে মে— অতি কষ্টে সারাদিন ধরে বরফ ঢাকা ঢালু পথ বেয়ে ধীরে ধীরে লড়াই করে চলেছি। মাঝে মাঝে বিশ্রামের জন্যে বসতে হচ্ছে। সূর্যাস্তের আগে আমরা সেবা পাহাড়ের বাঁদিকের চূড়োর ঠিক গোল মাথার নীচে পৌঁছুলাম। জমাট বরফের মসৃণ পাহাড় হাজার ফুট উঁচুতে উঠে গেছে।"

এইবার ডাইরী ছেড়ে সোজাসুজি আমাকে বলতে হবে। কারণ এর পরের ঘটনাগুলি বিস্তৃত ভাবে বলা দরকার।

সূর্যাস্তে প্রাকৃতিক শোভা দ্বিগুণতর সুন্দর হয়ে উঠেছিল। সেই নয়ন ভুলানো দৃশ্যে ঐ অবস্থাতেও আমরা মুগ্ধ না হয়ে থাকতে পারলাম না। আমাদের মাথার ওপর তুষার শৃঙ্গ সোনালী আলোর মুকুটে অপরূপ মহিমামণ্ডিত হয়ে উঠলো।

হাঁফাতে হাঁফাতে গুড্ বলে উঠলো, "আমরা বোধ হয় সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোকের বর্ণিত গুহার কাছাকাছি এসেছি।"

"হ্যাঁ," আমি জবাব দিলাম, "যদি কাছে কোন গুহা থেকে থাকে তবেই এসেছি, নইলে নয়।"

স্যার হেনরী আপত্তি জানিয়ে বলে উঠলেন, "দেখো কোয়াটার মেইন অমন ধারা বলো না। বুড়ো সিলভেস্ত্রের ওপর আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে, জলের কথা কি তোমার মনে নেই! নিশ্চয়ই আমরা সেই জায়গাটা খুঁজে পাবো।"

আমি সহানুভূতিসূচক উত্তরে বলে উঠলাম, "সন্ধ্যার আগে সে গুহা খুঁজে না পাওয়া গেলে আমাদের সবাইকে শেষ হতে হবে এই আর কি!"

আমরা চুপ করে চলতে লাগলাম। উম্বোপা আমার পাশাপাশিই হাঁটছিল। চূড়োর দিক থেকে হঠাৎ নামা ঢালটার

দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে সে আমার হাত ধরে বলে উঠলো, "দেখুন—দেখুন"।

আমি তার দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখতে পেলাম যে, প্রায় দুশো গজ দূরে বরফের মধ্যে গুহার মতন কি একটা দেখা যাচ্ছে ।

"ওটাতো গুহাই!" উম্‌বোপা বলে উঠলো।

আমাদের সাধ্যমত দ্রুত পায়ে জায়গাটায় গিয়ে উপস্থিত হলাম। দেখলাম গর্তটা সিলভেস্ত্রের লেখা মতো সেই গুহার মুখই বটে। আমরা যেতে যেতেই সূর্য অদ্ভুত তাড়াতাড়ি ডুবে গেলো। এতো উচ্চতায় গোধূলির আলো প্রায় আসে না কাজেই আমরা মুস্কিলে পড়ে গেলাম। হামা দিয়ে গুহার মধ্যে ঢুকলাম। শীত কাটাবার জন্য জড়াজড়ি করে বসেই রাত কাটাবার ব্যবস্থা করলাম। কিন্তু প্রবল ঠাণ্ডায় আমাদের মতলব ভেস্তে গেলো। ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমরা সেই ভীষণ ঠাণ্ডায় বসে রইলাম! তাপ শূন্য ডিগ্রীর ও নীচে নেমে গেছে। তুষার বাস্প কখনও আমাদের হাত, কখনও মুখ, কখনও পা যেন কেটে কেটে নিয়ে যেতে লাগলো। শীতের এত ধার আগে তা জানতাম না। সবাই মিলে কুঁকড়ে মুকড়ে কুকুর কুণ্ডলী হয়েও শীত কাটাতে পারলাম না। বুঝলাম আমাদের উপোসী শরীরগুলোর মধ্যে গরম বলে কোন পদার্থ আর কিছুই নেই! আমার বিশ্বাস শুধু মনের জোরেই সে রাতে আমরা বেঁচে ছিলাম।

সেই নিস্তব্ধ গুহার মধ্যে খালি কাঁপুনির শব্দ প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো, হিঃ—হিঃ—হিঃ! হটেনটট্ ভেন্তেভোগেল সারা রাত দাঁতে দাঁত দিয়ে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছিল, ভোরের দিকে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে এক্কেবারে চুপ মেরে গেলো। আমার পিঠের সাথে পিঠ দিয়ে সে বসেছিল, তাই প্রথমটায় আমি ভাবলাম ও বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়লো।

কিন্তু ক্রমেই তার পিঠটা ঠাণ্ডা হতে লাগলো—শেষকালে মনে হলো ওর পিঠ যেন একেবারে বরফ হয়ে গেছে।

অবশেষে ভোরের আলো আমাদের গুহায় উঁকি মারলো। আমরা দেখতে পেলাম যে ভেন্‌তেভোগেল কাঠ হয়ে আমাদের সঙ্গে বসে আছে দেহে তার প্রাণের সাড়াটুকুও পর্যন্ত নেই। কাজেই কেন যে তার পিঠটাতে হিম-শীতল পরশ পাচ্ছিলাম, তা এখন পরিষ্কার হয়ে গেলো। দীর্ঘ নিঃশ্বাসের সাথে সাথেই বেচারার প্রাণটা বেরিয়ে গেছে। তার মরা দেহটা তখন জমে কাঠ হয়ে উঠেছে। ভীষণ ভয়ে আমরা সরে এলাম। তার লাসটা ঐখানেই হাঁটু জড়িয়ে বসা অবস্থাতেই পড়ে রইলো। হঠাৎ একটা ভীত আর্তনাদে আমি পিছনে মুখ ফিরিয়ে দেখি প্রায় বিশ ফুট দূরে, গুহার শেষ প্রান্তে আর এক মূর্তি—মাথাটা বুকের ওপর এসে ঠেকেছে আর হাত দুটো মাটিতে ঝুলছে। আমি মূর্তিটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে বুঝলাম লোকটা মৃত আর শ্বেতকায়।

আমরা দেখতে পারলাম না ; দারুণ তরাসে আমাদের প্রায় জমে যাওয়া হাত পা গুলো টেনে হিঁচড়ে কোন রকমে গুহা থেকে বেরিয়ে এলাম।

সম্রাট সলোমনের রাজপথ

মৃত দেহ দুটি পিছনে ফেলে আমরা সূর্যের আলোয় এগিয়ে চললাম। মাইল দেড়েক পথ চলার পর সেই উঁচু পাহাড়ী পথের একেবারে কিনারে এসে পৌঁছুলাম। নীচে কি আছে আর কিছুই দেখা যায় না। সকাল বেলাকার প্রচণ্ড ঢেউয়ের মতন কুয়াশায় নীচের পৃথিবী ঢাকা। কিছুক্ষণ বাদে উপর দিকে কুয়াশার পর্দাটা পাতলা হয়ে গেলো। তখন আমাদের নজরে পড়লো প্রায় পাঁচশো গজ নীচে একটুকরো সবুজ ঘাসের ফালির মধ্য দিয়ে একটি জলধারা বয়ে চলেছে। শুধু তাই নয়, দেখলাম যে, সেই জলের ধারে দাঁড়িয়ে দশ পনেরোটা বড় বড় হরিণ রোদ পোয়াচ্ছে।

এমন শিকার হাতছাড়া করা হবে কি না, সে সম্বন্ধে সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আলোচনা হয়ে গেলো। কিন্তু শেষকালে নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে আমাদের লোভ সম্বরণ করতে হলো। কারণ প্রথমতঃ বাতাস আমাদের অনুকুল ছিলো না, তাছাড়া হাজার সতর্ক হলেও বরফের ওপর দিয়ে এতোটা পথ যেতে গেলে তারা আমাদের গতিবিধি সম্বন্ধে জেনে ফেলতোই।

"এখান থেকেই একবার চেষ্টা করে দেখা যাক না," স্যার হেনরী মত প্রকাশ করলেন।

তাই ঠিক হলো। আমি বললাম, "আমাদের যার সামনে যে হরিণটি আছে সে সেই হরিণটির দিকেই তাক করুক। ঘাড় আর তার ওপরের

দিকেই যেন সবার কড়া নজর থাকে। উম্‌বোপা, তুই হুকুম দিলেই আমরা তিনজনে একসঙ্গে গুলি চালাবো।”

আমরা সবাই যেন জীবন পণ করে বন্দুক ধরলাম। উম্‌বোপা জুলু ভাষায় হেঁকে উঠলো, “দাগুন।” সঙ্গে সঙ্গে আমাদের তিনটে বন্দুক এক সাথে গর্জে উঠলো। তিনটে ধোঁয়ার কুণ্ডলী কয়েক মুহূর্তের জন্য আমাদের চোখের ওপর পাক খেতে লাগলো। নিস্তব্ধ তুষার পর্বতে বন্দুকের শব্দ হাজার হাজার বার প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠলো। ধোঁয়া কেটে গেলে উল্লাসে আমরা চেয়ে দেখলাম, একটা বেশ বড় হরিণ মরণ যন্ত্রণায় আকাশে পা ছুঁড়ছে।

দুর্বল থাকলেও আমরা উৎরাইয়ের বরফ ঢাকা ঢাল বেয়ে সেখানে একরকম হুড়-মুড়িয়ে গিয়ে হাজির হলাম। এবং শিকারের মিনিট দশেকের মধ্যেই জন্তুটার মেটে আর হৃদপিণ্ডটা আমাদের হাতে এসে গেলো। কিন্তু মুস্কিল বাঁধলো আগুন নিয়ে। আমাদের সঙ্গে আগুন করার মতন কিছু ছিল না। কাজেই ওগুলো রাঁধবার মতন আগুন জোগাড় করতে না পেরে পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

“উপবাস ক্লিষ্ট মানুষের কল্পনা বিলাসী হলে চলেনা” গুড্ বলে উঠলো, “আমরা কাঁচাই চালাবো।”

এর চেয়ে আরও ভালো ভাবে ঐ সঙ্কটের সমাধান কেউ করতে পারতো বলে মনে হয় না। অন্য সময়ে হলে তবু কথা ছিল, কিন্তু তখন খিদেয় পেটের নাড়ীতে যে রকম কামড় দিচ্ছিলো, তাতে সে সময় উপদেশটা মোটেই কিছু একটা অসম্ভব বলে মনে হলো না। আমরা মেটে আর হৃদপিণ্ড খানিকটা বরফ সরিয়ে পুঁতে ফেললাম। কিছুক্ষণ বাদে, কাছেই নদীর হিমশীতল জলে সেগুলো ধুয়ে পেটুকের মতই

মুখে পুরতে লাগলাম। ব্যাপারটা শুনতে যতই বীভৎস লাগুক না কেন আমি কিন্তু জীবনে সেই কাঁচা মাংসের মতন আর কিছুই খাইনি।

মিনিট পনেরোর মধ্যে আমরা একদম অন্য মানুষ বনে গেলাম। উপোসী পেটে অতি ভোজনের ফলাফল স্মরণ করে একটু সংযত হয়েই আমাদের খিদে রেখে খাওয়া শেষ করতে হলো।

এযাবৎ কাল আমরা খাওয়া নিয়েই এতো ব্যস্ত ছিলাম যে, আশে-পাশের দিকে নজর দেবারও অবসর ছিলো না। ভবিষ্যতে সঙ্গে নিয়ে যাবার মতো সেরা মাংস কেটে আনবার জন্যে উম্‌বোপাকে নিযুক্ত করে আমরা এবার চরিদিকে চেয়ে দেখলাম। কুয়াশা কেটে যাওয়াতে সমস্ত দৃশ্যটা আমাদের সামনে ভেসে উঠলো।

দেখতে দেখতে দুটো জিনিস আমাদের খুব আকৃষ্ট করলো। প্রথম হলো আমরা যে জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিলাম তার উচ্চতা। আমাদের মনে হলো জায়গাটা মরুভূমি থেকে অন্ততঃ তিন হাজার ফুট উঁচু। দ্বিতীয়তঃ সমস্ত নদীগুলোই দক্ষিণ থেকে উত্তরে নেবে যাচ্ছিলো। আসবার সময় পথে নদী না পাওয়ার কারণ এতক্ষণে বুঝতে পারলাম। আমরা বিশাল পাহাড়ের যেদিকটায় দাঁড়িয়ে ছিলাম সেদিকটা দক্ষিণ দিক—সেদিকে কোন জলের চিহ্নও ছিলনা। কিন্তু অনেকগুলো জল-ধারা আমাদের নজরে পড়লো। সেগুলো প্রায় সবই কিছুদূর এসে, একসাথে মিশে, এক বিশাল নদীর আকারে দৃষ্টিপথ ছাড়িয়ে সর্পিল গতিতে সুদূরের দিকে মিলিয়ে গেছে।

আমরা সেখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেবার পর স্যার হেনরী বলে উঠলেন, "ম্যাপেতে সলোমনের রাজপথ সম্বন্ধে একটা কথা ছিল না?"

দূরের দিকে চোখ রেখে আমি মাথা নাড়লাম।

"ওহে, ঐ পথটাই বোধ হয় হোথায় দেখা যাচ্ছে," বলে তিনি আমাদের ডান দিকে আঙ্গুল তুলে দেখালেন।

গুড্ আর আমি সেদিকে তাকিয়ে দূরে সমতল ভূমির দিকে একটা ফটক-ওয়ালা চওড়া রাস্তার মতন পথ, এঁকে বেঁকে চলে গেছে দেখতে পেলাম। পথটা দূরে সমতল ভূমিতে নেমে ভাঙাচোরা ঢিবির মধ্যে বেঁকে যাওয়াতে প্রথমটা আমাদের নজরে আসেনি।

গুড্ বল্‌লো, "ডান দিক দিয়ে গেলে রাস্তাটাতে আমরা খুব শীগ্‌গীর পৌঁছুতে পারবো বলে মনে হচ্ছে। এখন যাত্রা করলে হয় না?"

কথাটা ভালোই মনে হলো। নদীতে হাত মুখ ধুয়ে আমরা চললাম। মাইলখানেক পথ কখনও পাথর কখনও বরফের ওপর দিয়ে যাবার পর আমরা পথটা দেখতে পেলাম। চমৎকার পথ। বড় বড় পাথর কেটে তৈরী পঞ্চাশ ফিট প্রায় চওড়া। ভাঙাচোরার দাগ কোথাও নেই।

আমরা সেই পথ ধরে নামতে লাগলাম। ভরা পেটে চমৎকার রাস্তা ধরে নামতে নামতে সেদিনকার সেই অনাহারে, শীতে, বরফঢাকা খাড়াই পাহাড়ে ওঠার কথা মনে করে ভারী অদ্ভুত লাগতে লাগলো। নীচের দিকে নামবার সাথে সাথে আবহাওয়া ভারী আরামদায়ক হয়ে উঠলো। আমাদের সামনে গাছপালা মাটি সব আরো সুন্দর ঝকঝকে হয়ে উঠলো। রাস্তার কথা কি বলবো, ওরকম সুন্দর রাস্তা আমি জীবনে কখনো দেখিনি। পুরানোদিনের ইন্‌জিনীয়ারদের কাছে কোন বাধাই আর বাধা ছিল বলে মনে হলো না। পথটা গেছে কোথাও নদীর ওপর দিয়ে, কোথাও গভীর খাদের পাশ দিয়ে, কোথাও খাড়াই পাহাড়ের গা বেয়ে এঁকে বেঁকে, কোথাও বা পাহাড় ফুঁড়ে গুহার মধ্য

দিয়ে। একটা গুহার দেওয়ালে অদ্ভুত প্রাচীন মূর্তি ও একটি যুদ্ধের দৃশ্য দেখে অবাক হয়ে গেলাম। স্যার হেনরী এই প্রাচীন শিল্পকলা দেখে বলে উঠলেন, "হ্যাঁ, এটাকে সলোমনের রাজপথই বলা যেতে পারে বটে। তবে আমার মনে হয় সলোমনের আগে ইজিপ্টের লোকেরাও এখানে এসেছিল। শিল্পে তাদেরই নিদর্শন পাচ্ছি।

দুপুরের দিকে পাহাড় থেকে বনাকীর্ণ ভূমিতে নেমে এলাম। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কয়েকটি ঝোপের পরই বন ঘন হয়ে উঠেছে। গোটা কতক বাঁকঘুরে পথটা একটা দীর্ঘ রূপালী গাছের ঝোপের মাঝ দিয়ে চলে গেছে দেখতে পেলাম। এর আগে একবার মাত্র কেপ্‌টাউনে আমি এই গাছ দেখেছিলাম। এখন তাদের আকৃতি আমাকে আকৃষ্ট করে তুল্‌লো। 'রূপালী' গাছের ঝক্‌ঝকে পাতা দেখতে দেখতে গুড্‌ বলে উঠলো "এখানে তো কাঠের অভাব নেই দেখছি। একটু রান্না করে খেলে মন্দ হয় না। সেই কাঁচা মেটে তো কখন হজম হয়ে ভূত হয়ে গেছে।"

এতে কারুর আপত্তি দেখা গেলো না। আমরা সবাই পথ ছেড়ে নদীর ধারে গিয়ে বসলাম। আগুন জ্বালিয়ে আমাদের সঙ্গে আনা মাংস কেটে কাঠির আগায় গেঁথে কাফিরদের মত রোষ্ট বানাতে বসলাম। পেটপুরে খেয়েদেয়ে আমরা পাইপ ধরিয়ে আরামসে একটু গড়িয়ে নেবার চেষ্টা দেখতে লাগলাম।

জায়গাটির রমণীয়তা, বিপদ কাটিয়ে আসার আত্মম্ভরিতা, ঈপ্সিত জায়গায় পৌঁছুবার তৃপ্তি, সব মিলিয়ে আমাদের যেন মন্ত্রমুগ্ধের মত স্তব্ধ করে রেখেছিল। স্যার হেনরী আর উম্‌বোপা দু'জনে ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরাজী আর অচল জুলুতে আস্তে আস্তে আলাপে মত্ত হয়ে পড়লো। শুয়ে শুয়ে ফার্ণের গন্ধে আমার চোখ দুটো বুজে

আসতে লাগলো। এমন সময় আমার মনে হলো গুড্ যেন কাছে কোথাও নেই। চোখ ঘুরিয়ে দেখতে পেলাম, সে চান করে উঠে নদীর পাড়ে ধোলাই আর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হতে ব্যস্ত। পোষাক পরিচ্ছদ-গুলো সব ঝেড়ে ঝুড়ে ডাঙার ওপর পাট করে রেখে এক মুঠো ফার্ণ ছিঁড়ে তার সাহায্যে জুতো জোড়া সাফ্ করতে বসেছে। ধূলো বালি ঝেড়ে সে একটু চর্বি বের করে জুতোতে ঘষতে লাগলো। চর্বির টুকরোটা সে হরিণের মাংস কাটার সময় সরিয়ে রেখেছিল। ঘসাঘসিতে জুতো জোড়া বেশ ভদ্রলোকের মতই হয়ে উঠলো। চশমার মধ্য দিয়ে জুতো জোড়া বেশ ভালো ভাবে পরীক্ষা করে পায়ে গলালো। এর পর তার আবার নতুন কাজ সুরু হলো। তার সঙ্গের ছোট ব্যাগটা থেকে একটা আয়না লাগানো পকেট চিরুনী বের করে আত্ম-দর্শন করতে বসলো সে। আয়নার চেহারাটা যে তার তেমন মনঃপূত হলো না, তা তার চুল ফেরাবার বহর দেখেই বোঝা গেলো। তারপর কি যেন তার মনে হলো, একটু থেমে সে থুত্নিতে হাত ঘসতে লাগলো। সেখানে এই দশদিনের লম্বা দাড়ির ঝোপ বেশ থোপা বেঁধেই শোভা বর্দ্ধন করছিল।

আমি ভাবলাম—দাড়ি নিশ্চয়ই এখন সে কামাতে যাচ্ছে না। কিন্তু ব্যাপার তাই ঘটলো। দেখি কি জুতোয় ঘসা সেই চর্বি টুকরোটা বেশ করে সে জলে ধুয়ে নিলো। তারপর তার সেই ছোট ব্যাগটা আবার হাতড়ে একটা ছোট পকেট খুর বের করে সারা গালে আচ্ছা করে চর্বি ঘষে দাড়ি কামাতে সুরু করে দিলে। কিন্তু পন্থাটা মোটেই তেমন আরাম দায়ক হলো না। কামাতে কামাতে মাঝে মাঝে ব্যথায় গুড্ চেঁচাতে লাগলো। দাড়ির গোছার সঙ্গে তার লড়াই দেখে মনে মনে আমার বেজায় হাসি পেলো। এই অবস্থায় কেউ যে আবার

একটুক্‌রো চর্বির সাহায্যে দাড়ি কামাতে ব্যগ্র হয়ে উঠবে, ভাবতেও আমার কেমন লাগছিলো। দেখলুম অনেক কষ্টে সৃষ্টে গুড. তার ডান দিকের গাল সাফ করে আনলো। এমন সময় হঠাৎ তার মাথার ওপর দিয়ে স্যাঁৎ করে এক ঝলক্ আলো চলে যাওয়াতে আমি চম্‌কে উঠলাম।

গুড্ লাফিয়ে উঠলো। আমি সঙ্গে সঙ্গে উঠেই দেখি, যে, আমার কাছ থেকে প্রায় বিশ কদম আর গুডে্র কাছ থেকে দশ কদম দূরে একদল লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে। চেহারাগুলো তাদের খুব লম্বা, তামাটে বরণ—কারুর মাথায় কালো কালো পালক, পরণে বাঘছালের জামা। সেই মুহূর্তে তাদের এটুকুই আমার নজরে পড়লো। তাদের সামনে ১৭।১৮ বছর বয়সের এক তরুণ, বর্শা ছোঁড়ার ভঙ্গীতে গ্রীসিয়ান স্ট্যাচুর মতন বেঁকে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আলোর ঝল্‌কানিটা যে তারই ছোঁড়া অস্ত্রের, তা বুঝতে কষ্ট হলো না।

আমি চেয়ে থাকতে থাকতেই দেখতে পেলাম, সৈনিকের মতন দেখতে একজন বয়স্ক লোক, দলের মধ্য থেকে এগিয়ে এসে তরুণটির হাত চেপে ধরে কি যেন বল্‌লো, তারপর জোট বেঁধে তারা আমাদের দিকে অগ্রসর হলো।

ইতোমধ্যে স্যার হেনরী, গুড্, উমবোপা তাদের রাইফেল উঁচিয়ে শাসাতে লাগলো। লোকগুলো কোন কিছু গ্রাহ্য না করেই এগিয়ে আসতে লাগলো। আমার মনে হলো ওরা বোধ হয় রাইফেলের দৌড় জানে না; জানলে নিশ্চয় অতটা তাচ্ছিল্য করতে সাহস করতো না;

তাদের খুসি করতে পারলেই যে আমরা নিরাপদ সেই কথা বিবেচনা করে হেঁকে উঠলাম, "বন্দুক নামাও।" সবাই আমার কথা মত বন্দুক নামিয়ে নিলো। আমি এগিয়ে গিয়ে সেই বৃদ্ধ লোকটিকে

কোন্ ভাষায় কথা বলবো ভেবে না পেয়ে জুলুতেই বললাম, "নমস্কার!" আশ্চর্য লোকটা আমার কথা বুঝলো।

"নমস্কার," জবাবটা জুলুতে না হলেও জুলুর কাছাকাছি এমন এক বুলিতে লোকটি উত্তর দিলো যে, আমার বা উম্‌বোপার তা বুঝতে কিছুমাত্র বেগ পেতে হলো না।

"কোথা হতে আসা হচ্ছে?" সে জিজ্ঞাসা করতে লাগলো, "তোরা কে? তোদের তিনজনের চেহারা সাদা আর চতুর্থ জনার চেহারা আমাদের মায়ের ব্যাটার মতন কেন?"

তার কথা বলার সময় উম্‌বোপার দিকে চেয়ে আমার হঠাৎ মনে হলো কথাটা বুড়ো কেমন ঠিকই বলছে। উম্‌বোপার চেহারাটার সঙ্গে তাদের চেহারার একটা সাদৃশ্য রয়েছে। তার লম্বা, দীর্ঘ দেহটা যেন তাদেরই অনুরূপ। কিন্তু তখন এই অদ্ভুত সাদৃশ্যের কথা চিন্তা করার আমার সময় ছিল না। আমার কথা বোঝবার সুযোগ দিয়ে ধীরে ধীরে তাকে আমি জবাব দিলাম, "আমরা দূর দেশের লোক—বাদ-বিসংবাদ করতে আসিনি। সঙ্গের লোকটা আমাদের চাকর।"

"মিথ্যে কথা," লোকটা হেঁকে উঠলো, "কোন বিদেশীই ঐ পাহাড় ডিঙিয়ে এখানে আসতে পারে না—সাক্ষাৎ যম বসে আছে ওখানে। তা যা হোক তোদের মিথ্যেতে কিছু যায় আসে না। যদি তোরা বিদেশী হোস তবে মরবার জন্যে তৈরী হ'—জানিস না, কুকুয়ানাদের দেশে কোন বিদেশীর বেঁচে থাকার হুকুম নেই। এদেশের রাজার আইন এই—নে, তৈরী হ'—মরার জন্যে তোরা তৈরী হ'!"

কথা শুনে আমি ভড়কে গেলাম। বিশেষ করে যখন দেখতে পেলাম যে তাদের হাতগুলো নিঃশব্দে কোমরে ঝোলানো ভারী ভারী লম্বা গোছের ছোরার দিকে নেমে গেলো।

"কুত্তাটা বলে কি ?" গুড্ জিজ্ঞাসা করে উঠলো।

আমি জবাব দিলাম, "লোকটা বলছে যে আমাদের কোতল করা হবে।"

"ও লর্ড!" যেন ঘা খেয়ে গুড্ চেঁচিয়ে উঠলো। তারপর তার স্বভাবসিদ্ধ বিচলিত অবস্থায় সে তার নকল দাঁতের ওপরকার পাটি খুলে নামিয়ে, তক্ষুনি আবার সটাৎ করে ভিতরে টেনে সেটা মাড়িতে বসিয়ে দিলে। ব্যাপারটা খুব ভালেই ঘটে গেলো। কারণ মহামহিমার্ণব কুকুয়ানা মহোদয়রা তাই দেখে কয়েক হাত পিছিয়ে গিয়ে ভয়ে চীৎকার করে উঠলেন।

"ব্যাপার কি ?" আমি বলে উঠলাম।

স্যার হেনরী একটু উত্তেজিত স্বরেই বলে উঠলেন, "গুডে্র দাঁতের খেলা। গুড্ শিগ্গীর দাঁত খুলে ফেলো।" গুড্ তার ফ্লানেল সার্টের আস্তিনের মধ্যে দাঁতের পাটি তক্ষুনি লুকিয়ে ফেললো।

পরমুহূর্তে তাদের ভয় কৌতূহলে পরিণত হয়ে উঠলো। ভয় ভুলে তারা এক পা এক পা করে এগিয়ে আসতে লাগলো। ইতোমধ্যে আমাদের হত্যা করার আন্তরিক ইচ্ছাটা তাদের দূর হয়ে গেছে মনে হলো।

সেই বুড়ো লোকটা বেশ ভারিক্কী চালেই গুড্কে দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলো, "আচ্ছা বিদেশী, ওই যে মোটা লোকটা—যার গায়ে জামা অথচ পা খালি, গালের একদিকে দাড়ি আর একদিকে নেই, যার ঝক্ঝকে কাঁচের চোখ, ও লোকটার দাঁত কেমন করে আপ্না থেকে মাড়িতে বসছে আর উঠছে ?"

আমি গুড্কে হাঁ করতে বললাম। সে তক্ষুনি জিব গুটিয়ে হাঁ করে রাগী কুকুরের মতন বুড়ো লোকটার চোখের ওপর গোলাপী মাড়ি

বের করে দাঁড়ালো, দর্শকরা স্তম্ভিত হয়ে গেলো। তারা চেঁচিয়ে উঠলো, "গেলো কোথায় ওর দাঁত ? নিজের চোখে যে দেখলুম এই একটু আগে !"

গুড্ ধীরে ধীরে মুখ ফিরিয়ে, এক ঝট্‌কায়, মুখের ওপর একবার হাত বুলিয়ে দু'পাটি ঝক্‌ঝকে দাঁত নিয়ে একেবারে ভেংচি কেটে দাঁড়ালো।

যে তরুণটি ছুরি ছুঁড়ে মেরেছিল সে সঙ্গে সঙ্গে সটান একেবারে মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে ভয়ে কুকুরের মতন চেঁচাতে লাগলো। বুড়ো লোকটাও কম্‌তি গেলো না, তার হাঁটু দুটো খালি ঠকাঠক্ ঠোকাঠুকি খেতে লাগলো। কাঁপতে কাঁপতে সে বলতে লাগলো, "ভূত—সবাই ভূত তোমরা। মানুষের এক গালে কি কখনও দাড়ি হয়, না অমন গোল স্বচ্ছ চোখ হয়, না দাঁত উবে গিয়ে আবার দাঁত গজায় ? হেঁই দেবতা ক্ষমা দাও, সব ক্ষমা দাও।"

আমাদের বরাত ঘুরে গেলো। সুযোগ বুঝে আমি রাজোচিত ভাবে উত্তর করলাম, "তথাস্তু ! তবে শোন্ বলি,—যদিও দেখতে আমরা তোদের মতনই মানুষ, তবে আসছি আমরা সেই মস্ত তারার থেকে যেটা রাতের বেলায় তোদের মাথার ওপর জ্বল্ জ্বল্ করে জ্বলে।"

"ও ! ও !" করে সমবেত কণ্ঠে আশ্চর্য সূচক ধ্বনি করে উঠলো অরণ্যের সেই আদিবাসীরা।

"হুঁ-রে—বেটা হুঁ !" বলতে বলতে আমি তাদের ওপর খানিকটা অনুগ্রহের হাসি বর্ষণ করে সুরু করলাম, "আমরা তোদের দেশে এসেছি আমাদের ক্ষণিক পবিত্র সঙ্গ দিয়ে তোদের ধন্য করতে !"

সকলে বলে উঠলো, "আজ্ঞে ঠিক, বটে ঠিক।"

আমি বলে যেতে লাগ্‌লাম, "এখন কি মনে হয় ? তোদের এই অভ্যর্থনার জন্য আমরা শোধ নেবো না ? যে অপবিত্র হাত ঐ অদৃশ্য-দন্তাধিকারী মহাত্মার দিকে অস্ত্র নিক্ষেপ করেছে, তাকে কি নির্মম মৃত্যু দণ্ড দেবো না ?"

বুড়ো বিনীতভাবে আর্তনাদ করে উঠলো, "রক্ষা করো প্রভু, ওকে রক্ষা করো ; ও আমাদের যুবরাজ। আমি ওর খুড়ো। ওর কোন অনিষ্ট হলে রক্তমূল্যে আমাকে তা শোধ করতে হবে।"

যুবকটিও জোর দিয়ে বলে উঠলো, "আজ্ঞে ঠিক তাই বটে।"

আমি কোন কিছু খেয়াল না করে বলে যেতে লাগলাম, "এখনও তোদের সন্দেহ ? দাঁড়া দেখাচ্ছি" বলে, উম্‌বোপাকে চোখের ইশারায় এক্সপ্রেস রাইফেলটা দেখিয়ে দিয়ে নিতান্ত অসভ্যের মতনই হেঁকে উঠলাম, "ওরে ব্যাটা কুত্তো, আমার সেই কথা কওয়া যাদুমন্ত্রের নলটা আনতো !"

উম্‌বোপা সময়োচিত বিনয়ের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে, "এই যে মহাপ্রভু" বল্‌তে বল্‌তে রাইফেলটা আমার হাতে দিয়ে গেলো।

রাইফেলটা চাইবার আগেই সেখান থেকে প্রায় সত্তর গজ দূরে পাথরের ডিপির ওপর একটা ক্লিপ স্প্রিংগার হরিণকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলাম, তারই ওপর একটু পরখ করে দেখাতে ইচ্ছা হলো।

লোকগুলোকে হরিণটা দেখিয়ে আমি বললাম, "ঐ হরিণটাকে দেখতে পাচ্ছিস ? আচ্ছা বল এখন, শুধু শব্দ করে মানুষের পক্ষে ওটা মারা সম্ভব কিনা ?"

"অসম্ভব প্রভু !" বুড়ো লোকটা উত্তর দিলো।

আমি গম্ভীর ভাবে বললাম "দেখ সেই অসম্ভবকে আমি সম্ভব করবো।"

বুড়ো লোকটা হাসলো, তারপর বললো, "আপনি তা পারবেন না প্রভু।"

আমি রাইফেল তুলে তাগ্ করলাম। ছোট হরিণ, ফস্‌কালেও মানুষের পক্ষে কিছু বলার নেই। কিন্তু আমার ফস্‌কালে চলবে না। হরিণটা নিশ্চল পাথরের মত দাঁড়িয়ে ছিল। আমি নিঃশ্বাস টেনে ঘোড়া টিপলাম।

"ডুডুম! ধপাস!" করে একটা আওয়াজ হলো। হরিণটা একবার শূন্যে লাফিয়ে উঠে পাহারের ওপর ধপ্ করে শুকনো কাঠের মত পড়ে গেলো।

আমার সামনে দলটার মধ্য থেকে ভয়ের একটা অস্পষ্ট গুঞ্জন উঠলো।

আমি স্থিরভাবে বললাম, "যদি মাংস চাস্ তো হরিণটাকে নিতে পারিস।"

বুড়োর ইঙ্গিতে একজন গিয়ে হরিণটাকে নিয়ে এলো। আমি দেখে নিশ্চিন্ত হলাম যে, গুলিটা হরিণের একেবারে কাঁধের মধ্য দিয়ে চলে গেছে। বলে উঠলাম "দেখ্‌ছিস্? ভাওতা মারা কথা আমরা বলি না। তবে এখনও যদি তোদের কারুর সন্দেহ থাকে, তবে দাঁড়া গিয়ে পাহাড়ের ওপর, তারপর হরিণের মতই আমি তার ব্যবস্থা করছি।"

"ভালোই হয়েছে" রাজকুমারটি বলে উঠলো, "খুড়ো, তুমি গিয়ে ওখানে দাঁড়াও। ও যাদুতে হরিণ মরে, মানুষ মরে না!"

বুড়ো কথাটায় একটু অসন্তুষ্টই বোধ করলো, সে তাড়াতাড়ি বলে উঠলো, "ওরে আমার এই বুড়ো চোখ দুটো ঢের দেখেছে! ওরা ভেল্কী জানে ; চল, ওদের আমরা রাজার কাছে নিয়ে যাই। তবে হতভাগারা তোরা যদি আরও কিছু প্রমাণ পেতে চাস্ তো, যার খুসি সে দাঁড়া গিয়ে ওখানে ; ভূতুড়ে নল তার সঙ্গে অনেক কথাই কইবে।"

সকলেই সঙ্গে সঙ্গে প্রবল আপত্তি করে উঠলো। একজন তো বলেই উঠলো, "যথেষ্ট হয়েছে, আমরা আর প্রমাণ চাই না আমাদের কোন যাদুবিদ্ই এরকম ভেল্কী দেখাতে পারে না।"

বুড়ো একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললো, "ঠিক কথা, এতে কোন সন্দেহ নেই! ওগো তারার দেশের লোকেরা বলি শোনো, আমার নাম ইন্ফাদুস্। বাপের নাম কাফা। আমার বাপ এককালে ছিলেন এই কুকুয়ানাদের রাজা। যুবক স্কাগ্গা মহারাজ তওয়ালার পুত্র। মহান সম্রাট তওয়ালা হাজার মহিষীর অধীশ্বর, কুকুয়ানাদের একছত্র সর্বাধিনায়ক, ঐ বিশাল রাজপথের রক্ষক—শত্রু বিমর্দক ভৌতিক বিদ্যার উপাসক—লক্ষ সৈনিকের পরিচালক—একচক্ষু, কালান্তক।"

"বেশ!" আমিও রাজকীয় ভঙ্গীতে বলে উঠলাম, "তবে নিয়ে চল আমাদের সেই তওয়ালার কাছে—তার দাসানুদাসের সঙ্গে আমরা বাক্যালাপ করি না।"

"তাই হোক প্রভু। আপনাদের আমরা তাঁর কাছেই নিয়ে যাবো। তবে শিকার করতে করতে আমরা রাজ প্রসাদ থেকে প্রায় তিন দিনের পথ চলে এসেছি। কাজেই, আপনাদের একটু ধৈর্য ধরতে হবে হুজুর।"

বুড়ো খুব ভক্তি ভরে প্রণাম ক'রে "কুম্! কুম্!" বলে তার লোকজনদের কি এক আদেশ দিলো! কথাটার মানে তখন অবশ্য আমি বুঝতে পারিনি, তবে পরে জেনেছিলাম যে, রাজকীয় অভিবাদন অর্থেই ওদের মধ্যে ঐ শব্দটা চলতো।

ইন্ফাডুসের লোকেরা তক্ষুনি আমাদের পোঁট্লা-পুট্লি ঘাড়ে করে নিলেও বন্দুক বইতে তারা কোন মতেই রাজী হলো না। গুডের পাট করা জামাগুলোও তারা নিতে যাচ্ছিল। গুড্ তা দেখে, 'গেলো গেলো' করে হুমড়ি খেয়ে পড়লো।

"সে কি প্রভু!" ইন্ফাডুস্ বলে উঠলো, আপনি হলেন স্বচ্ছ চক্ষু ও অদৃশ্য-দন্তের দেবতা, আপনার জিনিস আপনার দাসদের বইবার অনুমতি দিন।"

"আরে আমি যে ওগুলো পারবো।" গুড্ আপত্তি করে উঠলো। উম্বোপা সে কথা অনুবাদ করে জানিয়ে দিলে।

কুকুয়ানারা এতে মনঃক্ষুন্ন হলো। তাদের ইচ্ছা যে গুডের তুষার শুভ্র চরণ দর্শনে তারা যেন বঞ্চিত না হয়।

স্যার হেনরী বলে উঠলেন, "দেখো গুড্ তুমি এদের কাছে একটা বিশেষ রূপে দেখা দিয়েছো, কাজেই তোমাকে সেই ভাবেই থাকতে হবে। এখন থেকে তোমাকে সব সময় খালি পায়ে আর চোখে চশমা দিয়ে চলতে হবে।"

"হ্যাঁ, আর এখন থেকে কেবল গালের একদিকে দাড়ি রাখতেই হবে", আমি বললাম, "এই সব সাজগোজের এদিক ওদিক হলে ওরা ভাববে আমরা প্রবঞ্চক। ওদের যদি একটু সন্দেহ হয় তবে কিন্তু আমাদের জীবন শুদ্ধু বিপন্ন হয়ে উঠবে।"

মুখ ব্যাজার করে গুড্ বলে উঠলো, "সত্যিই কি তোমার তাই মনে হয় ?"

আমি বললাম, "হ্যাঁ, স্যার হেনরী যেমন বলেছেন, তোমাকে সেই ভাবেই চলতে হবে। তোমার সুন্দর সাদা পা আর চশমাই এখন আমাদের দলের বৈশিষ্ট্য। ভগবানকে ধন্যবাদ দাও যে এখনও মাথার ওপর উষ্ণ বাতাস অনুভব করতে পারছো।"

গুড্ কিছু না বলে শুধু একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়লো।

কুকুয়ানাদের দেশে

সেই চমৎকার রাস্তা দিয়ে আমরা সারা অপরাহ্ন উত্তর—পশ্চিমে হেঁটে চললাম। ইন্‌ফাডুস্ আর স্কাগ্‌গা আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চললো। দলের অন্য লোকেরা আমাদের পেছনে ফেলে অনেক রশি এগিয়ে গেলো। যেতে যেতে ইন্‌ফাডুসের কাছ থেকে তাদের অনেক কথাই জান্‌তে পারলাম। ইন্‌ফাডুস্ গল্পের ছলে বলে ফেল্‌লো যে তাদের সৈন্য সংখ্যা এতো যে, তারা এক সঙ্গে হলে সমস্ত মাঠ তাদের মাথার পালকে পালকে ঢাকা পড়ে যায়।

সমস্ত কথা শুনে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "দেশটা তো চারদিকে পাহাড় দিয়ে ঘেরা, তাহলে সৈন্যদের কার সঙ্গে লড়াই করার জন্যে রাখা হয়েছে ?"

"আপনি যা ভাবছেন তা নয়," ইন্‌ফাডুস্ বলতে লাগলো, "ঐ উত্তর দিকে পাহাড়ী পথ আছে। ঐ পথে মাঝে মাঝে মেঘের মতন দলে দলে কোথা থেকে শত্রু যে নেমে আসে আমরা বলতে পারিনে—তবে আমরা তাদের ফিরে যেতে দিই না। প্রায় বছর তিরিশ আগে একবার তাদের সাথে আমাদের লড়াই হয়েছিল। হাজারে হাজারে আমাদের লোক কাটা পড়েছিল। কিন্তু আমরাও সেই রাক্ষসদের আস্ত রাখিনি। তারপর আর লড়াই হয়নি।"

"সৈন্যরা শুধু শুধু বসে থাকতে থাকতে নিশ্চয়ই বিরক্ত হয়ে ওঠে ইন্‌ফাডুস্।"

"শত্রুদের সাথে লড়াই হবার পর আর এক লড়াই আমাদের লড়তে হয় প্রভু! তবে সে লড়াই হয়েছিল নিজেদের মধ্যে—কুত্তায় সেবার কুত্তা খেয়েছিল।"

"কি রকম?"

বর্তমান রাজা আমার সৎভাই। এই ভাই যখন জন্মায় তখন সেই সঙ্গেই আমার আর এক যমজ ভাই হয়। আমাদের দেশের নিয়ম যে, যমজ কখনও বেঁচে থাকতে পারবে না হুজুর। দুর্বল শিশুটীকে মরতেই হবে। কিন্তু পরে জন্মালেও রাজার মায়ের সেই দুর্বল শিশুটির ওপর কেমন মায়া হয়, তাই সে তাকে তখন লুকিয়ে ফেলে। সেই রাজাই হলো তওয়ালা। আমি তার ছোট ও সৎমায়ের পেটে হয়েছি।"

"হুম্, তারপর?"

"আমাদের বাবা কাফা যখন মারা যান, তখন আমাদের বয়স হয়েছে। ভাই ইমোতু তাঁর জায়গায় রাজা হয়। কিছুদিন সে রাজত্বও করে। তার পাটরাণীর একটি ছেলেও হয়। সেই শিশুটির যখন তিন বছর বয়স তখন আমাদের মধ্যে গৃহ বিবাদ বাধে। কয়েক বছর ধরে চাষবাস কিছুই হয়নি তাই সেবার অজন্মা দেখা দিলো। দুর্ভিক্ষে লোকেরা ক্ষেপে উঠলো। যেমন করে হোক এর থেকে তারা নিস্তার পাবার পথ খুঁজতে লাগলো। আমাদের জাতের সবচেয়ে বয়স্কা, সবচেয়ে ভয়ঙ্করী, সবচেয়ে জ্ঞানী, এবং চিরজীবী গাগুল বুড়ী, সবাইকে ডেকে বললে, 'ইমোতু দেশের রাজা নয়।' সেই সময় ইমোতু ক্ষতে ভুগছিল—ঘর থেকে বেরুবার তার ক্ষমতাটুকুও ছিল না।

"গাগুল তখন একটা কুঁড়ে থেকে আমার সৎভাই, অর্থাৎ তখনকার রাজার যমজ ভাই, তওয়ালাকে সকলের সামনে নিয়ে আসে। একেই

সে এতকাল পাহাড় পর্বতে লুকিয়ে রেখে মানুষ করেছিল। সকলের সামনে তার মুচা (কটিবাস) খুলে শরীরের মধ্যভাগে আঁকা কুকুয়ানাদের রাজচিহ্ন, কুণ্ডলী পাকানো পবিত্র সাপের দাগ—যা খালি রাজার বড়ছেলের জন্মকালে আঁকা হয়ে থাকে, তাই সকলকে দেখিয়ে চীৎকার করে ঘোষণা করে, 'এই তোদের রাজা, একেই এতোকাল আমি তোদের জন্যে বাঁচিয়ে রেখেছি।'

"অনাহারে ক্ষিপ্ত জনসাধারণ, সেই কথা শুনে, বিচার বুদ্ধি ও বিবেক জ্ঞান বর্জিত হয়ে চেঁচিয়ে উঠলো 'রাজা—আমাদের রাজা!' কিন্তু আমি জানি আসল ব্যাপার তা নয়। যমজ ভাইদের মধ্যে ইমোতুই বড়, আর সেই-ই ন্যায়সঙ্গত রাজা। সেই গগনভেদী উচ্ছ্বাসের ধ্বনিতে, ইমোতু তার স্ত্রীর হাত ধরে কোন রকমে টলতে টলতে কুটীর থেকে বেরিয়ে এলো। পিছনে পিছনে তাদের শিশুপুত্র ইগ্‌নোসিকেও দেখা গেলো।

'এতো সোর কিসের?' ইমোতু সবাইকে শুধালো, 'রাজা! রাজা! বলে চীৎকার করছো কেন সবাই?'

'ঠিক সেই মুহূর্তে তার আপন মায়ের পেটের ভাই তওয়ালা ছুটে গিয়ে তার চুলের মূঠি ধরে বুকে ছুরি বসিয়ে দিলে। অস্থির চিত্ত প্রজারা হাততালি দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো, 'তওয়ালা রাজা!' সেই থেকে আমরাও জানি তওয়ালা আমাদের রাজা।"

"ইমোতুর স্ত্রী আর তার শিশুপুত্র ইগ্‌নোসির কি হলো? তওয়ালা কি তাদেরও মেরে ফেললো না কি?"

"আজ্ঞে না প্রভু। রাণী তাঁর স্বামীর দুর্দশা দেখে শিশুপুত্রটিকে বুকে নিয়ে সেখান থেকে ছুটে পালিয়ে গেলেন। দু'দিন পরে পেটের জ্বালায় অস্থির হয়ে গাঁয়ের একটা কুটীরে ভিক্ষা করতে আসেন।

কিন্তু কেউ তাঁকে ভিক্ষা দিলে না। জানেন তো, হতভাগ্যদের সকলেই ঘৃণা করে থাকে। কিন্তু রাত্রি বেলা একটা ছোট মেয়ে লুকিয়ে তাঁকে কিছু খাবার দিয়ে আসে। রাণী মেয়েটিকে আশীর্বাদ করে ছেলেটিকে নিয়ে ঐ পাহাড়ের পথে চলে যান। সেই যে তাঁরা গেলেন, তারপর থেকে মা ছেলে কাউকেই আর দেখা যায়নি। বোধ করি ঐখানেই তাঁদের শেষ হয়ে থাকবে।"

"তা হলে ঐ শিশুপুত্র ইগ্‌নোসি যদি বেঁচে থাকে, তা হলে সে-ই হবে কুকুয়ানাদের সত্যিকারের রাজা, কেমন ?"

"আজ্ঞে প্রভু। তার দেহের মধ্যভাগে পবিত্র সর্পচিহ্ন রয়েছে কাজেই সে যদি বেঁচে থাকে তবে সেই হবে রাজা।"

উম্‌বোপা বরাবর আমার পিছনে পিছনেই আসছিল আর খুব মনোযোগ দিয়েই আমাদের দুজনের কথাবার্তা শুনছিল। এইখানে এসে হঠাৎ তার মাথার সঙ্গে আমার মাথাটা কেমন আশ্চর্য ভাবে ঠোকাঠুকি হয়ে গেলো বুঝলাম না।

আমরা নীচে বন্ধুর ভূমির দিকে বেশ জোরেই এগিয়ে চলছিলাম। আমাদের যাত্রা করার আগেই ইন্‌ফাদুস্‌ আমাদের উপস্থিতির সংবাদ একজনকে দিয়ে এখানে পাঠিয়ে দিয়েছিল। সেই সংবাদের ফলাফল এখন বেশ ভাল ভাবেই বুঝতে পারলাম। মাইল দুই দূরে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে দলে দলে সৈন্যরা মার্চ করে আমাদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগলো।

স্যার হেনরী আমার কাঁধে হাতদিয়ে মন্তব্য করলেন, যে, আমাদের বোধ হয় খুব গরম অভ্যর্থনার সম্মুখীন হতে হবে। তাঁর বলার ভঙ্গীটা ইন্‌ফাদুস্‌কে আকৃষ্ট করলো। সে তাড়াতাড়ি বলে উঠলো, "প্রভু কোন কিছু ভয় করবেন না এই সৈন্যদলটি

আমার অধীনে এবং আমার আজ্ঞাতেই আপনাদের অভ্যর্থনা জানাতে এসেছে।"

প্রাণের মধ্যে টিপ্ টিপ্ করলেও ওপরে আমি এমন ভাব দেখালাম যে কিছুই গ্রাহ্য করি না।

আমরা ঢালু রাস্তাটার শেষে পৌঁছুতেই সেখানে প্রায় বারো দল, মানে তিন হাজার তিনশো ষাটজন সৈন্য পথের দুধারে দাঁড়িয়ে গেলো।

আমরা প্রথম দলকে অতিক্রম করে চলে গেলাম। মনে হলো জীবনে কখনও এমন সৈন্যদল দেখি নি। প্রত্যেকেই ঝানু—চল্লিশের কাছাকাছি বয়স—ছ'ফুটের নীচে একটা লোকও নেই দলে। মাথায় কালো 'শাকাবুলা' পাখীর ঝাঁক্ড়া পালক। কোমরে আর ডান হাঁটুর নীচে সাদা ষাঁড়ের ল্যাজের বালা। আর প্রত্যেকের বাঁ হাতে বিশ ইঞ্চি চওড়া ঢাল।

তামার মূর্তির মতন প্রত্যেকটি দল নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। প্রত্যেক দলের সামনে দেখলাম, কয়েক পা দূরে একজন করে সর্দার চিতাবাঘের ছাল গায়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমরা সামনে দিয়ে যাওয়া মাত্র, একসাথে তাদের বর্শাফলক শূন্যে উঠে তিন শো কণ্ঠে রাজকীয় অভিবাদনের ধ্বনি উঠতে লাগলো "কুম্"। সর্বশেষ দলটিকে অতিক্রম করে যাওয়া মাত্রই, পদভরে মেদিনী কাঁপিয়ে আমাদের পেছন পেছন আসতে লাগলো কুকুয়ানাদের এই ঝানু সৈন্যদলের "ধূসর বাহিনী।"

অবশেষে সলোমনের রাজপথ ছেড়ে আমরা এক চওড়া পরিখার কাছে এসে পৌঁছুলাম। খালটা বৃত্তাকারে প্রায় মাইল খানেক লম্বা লাগলো—শক্ত গাছের গুঁড়ি দিয়ে চারদিকটা দুর্গের মতন ঘেরা। গড়খাইয়ের ওপর দিয়ে প্রাচান কালের মত টানা-পোলের সাহায্যে

বাইরের সঙ্গে যোগাযোগের পথ। প্রহরীরা আমাদের জন্য পুল ফেলে দিলো। গড়ের ভিতরটা আমাদের চমৎকার লাগলো। সমস্তটা একটা সুষ্ঠু পরিকল্পনা নিয়ে তৈরী।

গড়ের মধ্য-অংশে চারপাশে ছোট ছোট কুটিরে ঘেরা একটা বড় কুটীরের সামনে আমরা থামলাম। ইন্‌ফাদুস্ বেশ উচ্চ কণ্ঠেই আমাদের উদ্দেশ্য করে বললো, "হে তারকার সন্তানেরা আপনারা আমাদের এই ক্ষুদ্র কুটীরে খানিক বিশ্রাম করুন—অনাহারে আপনাদের যাতে কষ্ট না হয়, তার জন্য আপনাদের সামান্য কিছু উপকরণ পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

"উত্তম," আমি উত্তর দিলাম, "ইন্‌ফাদুস্ আমরা বায়ুস্তর দিয়ে আসার জন্য অত্যন্ত ক্লান্তি বোধ করছি। এখন আমরা খানিক বিশ্রামই করবো।"

আমরা কুটীরের মধ্যে প্রবেশ করে দেখলাম, আমাদের আয়েসের বেশ ভালো বন্দোবস্তই রয়েছে সেখানে। মুখ ধোবার জল, ঘুমোবার জন্যে চামড়ার কোচ--কিছুরই অভাব নেই। কিছুক্ষণ বাদেই বাইরে গোলমাল শুনে দরজার কাছে এসে দেখি, সার বেঁধে মেয়েরা পাত্রভরে সব দুধ, মধু বহন করে আনছে। আর পিছনে পিছনে কয়েকটি যুবক একটা বেশ মোটা সোটা ষাঁড় আমাদের জন্যে তাড়িয়ে নিয়ে আসছে। আমরা উপহারগুলি গ্রহণ করলাম। একটি যুবক তার কোমর থেকে ছুরি বের করে খুব তৎপরতার সঙ্গে ষাঁড়টার গলায় পোঁচ বসিয়ে শেষ করে দিলো। তারপর দশ মিনিটের মধ্যে ছাল ছাড়িয়ে কেটে কুটে সেটা আমাদের সামনে এনে হাজির করলো। আমরা মাংসের সেরা ভাগটা রেখে বাকীটা তাদের দিয়ে দিলাম।

উম্‌বোপা আমাদের রান্নার ভার নিলো। সেই রাতে আমরা ইন্‌ফাদুস্ ও যুবরাজ স্কাগ্‌গাকে আমাদের সঙ্গে নৈশ ভোজনের নিমন্ত্রণ

জানালাম। ছোট ছোট টুলে আমরা আসন গ্রহণ করলাম। বুড়ো ইন্‌ফাড়ুস্‌কে বেশ ভদ্র আর আলাপী লোক বলে মনে হলো। কিন্তু রাজকুমারটি কেমন যেন আমাদের সন্দেহের চোখে দেখতে লাগলো। যদিও আর সবায়ের মতই আমাদের সাদা চেহারা আর মন্ত্রপূত জিনিস দেখে সে অবাকই হয়েছিল কিন্তু তাদের মত আমরা খাই দাই ঘুমোই দেখে তার মনে বিস্ময় কেটে গিয়ে ঘোরতর চাপা সন্দেহ জেগে উঠছিল। এতে বেশ অস্বস্তিই বোধ করতে লাগলাম আমরা।

খাওয়া দাওয়া শেষ হবার একটু পরেই আমি ইন্‌ফাড়ুস্‌কে রাজার কাছে যাবার কথা জিজ্ঞাসা করলাম। উত্তরে সে জানালো যে, যাত্রার সব ব্যবস্থা ঠিক করা হয়েছে। কাল সকালেই আমরা যাত্রা করবো। তাছাড়া আমাদের আগমন সংবাদ আগেই রাজার কাছে পাঠানো হয়েছে। কথাবার্তায় জানতে পারলাম যে মহারাজ তওয়ালা 'লু' গাঁয়ে তার রাজপ্রাসাদে অবস্থান করছেন। জুনের প্রথম সপ্তাহে যে বাৎসরিক ভোজ-উৎসব হবে, তারই আয়োজনে তিনি এখন ব্যস্ত আছেন।

প্রাতঃকালেই আমাদের যাওয়া ঠিক হলো। পথের সঙ্গী ইন্‌ফাড়ুস্‌ জানালো যে, পথে আপদ বিপদে না আটকে গেলে বা নদীতে বান না ডেকে থাকলে 'লু' তে আমরা দ্বিতীয় দিন রাত্রেই পৌঁছুতে পারবো।

ওরা চলে গেলে পর আমরা ঘুমোবার জন্যে তৈরী হলাম। ঠিক হলো পালা করে আমরা একজন পাহারা দেবো আর তিনজন ঘুমোবে।

মহারাজ তওয়ালা

পুরো দু'টিদিন সলোমনের রাজপথ ধরে হাঁটবার পর আমরা সোজা খাস কুকুয়ানাদের দেশে এসে পৌঁছুলাম। দ্বিতীয় দিন সূর্যাস্তের সময় একটা পাহাড়ের মাথায় আমরা একটু বিশ্রাম নেবার জন্য বসলাম। সেখান থেকে 'লু' বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠলো। এক উর্বর সমতল ভূমির উপর মস্ত গাঁ। ওদের কথায় সহরই বলা যেতে পারে। আশে পাশের ছাড়া ছাড়া কুঁড়েগুলো দেখে মনে হলো গাঁ-টা পরিধিতে কমসে-কম মাইল পাঁচেক। দু'মাইল উত্তর দিয়ে ঘোড়ার খুরের মতন একটি পাহাড় সহরটাকে ঘিরে আছে। তখন জানতাম না এই পাহাড়ের সঙ্গেই আমাদের ভবিষ্যৎ জড়িয়ে আছে। সহরটাকে দু'ভাগে ভাগ করে মাঝ-খান দিয়ে একটা নদী বয়ে চলেছে। দুই অংশে যোগাযোগ রাখার জন্যে এখানে ওখানে অনেকগুলি সাঁকো রয়েছে দেখলাম। সহর থেকে প্রায় ষাট-সত্তর মাইল দূরে ত্রিভুজের আকারে তিনটি পাহাড় সমভূমি থেকে খাড়া উঠে গেছে নজরে পড়লো।

আমরা সেইদিকে চেয়ে আছি দেখে ইন্‌ফাদুস্ আপনা থেকেই মন্তব্য করে উঠলো, "ঐখানেই পথের শেষ। কুকুয়ানারা ঐ তিন পাহাড়ের নাম দিয়েছে তিন ডাইনী।"

"কেন, এখানে শেষ হলো কেন?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

"কে জানে কেন?" সে মাথা ঝাঁকিয়ে বলে উঠলো। "ঐ তিন পাহাড় গুহা-গহ্বরে ভর্তি আর তাদের মাঝে মাঝে আছে গভীর গর্ত।

প্রাচীনকালে সবজান্তা লোকেরা এদেশে এসে ঐ গহ্বরের মধ্যে যেতো তাদের ইপ্সিত জিনিস আনতে। ওসব জায়গায় আমরা এখন রাজাদের কবর দিয়ে থাকি। ওটাকে বলি যমপুরী।"

"কি জিনিস নিতে সেই সব লোকেরা আসতো?" আমি খুব আগ্রহভরে জিজ্ঞাসা করে উঠলাম।

সে একটা ক্ষিপ্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করে জবাব দিলে, "না—তা আমি জানি না। প্রভু, আপনারা তারার দেশ থেকে আসছেন, আপনারা নিশ্চয়ই জানেন তা কি?"

স্পষ্ট বুঝতে পারলাম লোকটা অনেক কিছুই জানে। কিন্তু মুখ খুলবে না। আমি তাড়াতাড়ি জবাব দিলাম, "হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছো। আমরা তারার দেশে অনেক খবরই জানতে পারি। আমি শুনেছি, প্রাচীনকালে এদেশে লোকেরা অসতো ঝক্‌মকে পাথর, সুন্দর সুন্দর খেলবার জিনিস, হল্‌দে লোহা এই সবের জন্যে!"

"প্রভু, আপনারা অনেক জানেন শোনেন, সে তুলনায় আমি শিশু, আমি আর কি বলবো—আপনারা রাজবাড়ীতে গাগুল বুড়ীকে সে কথা জিজ্ঞাসা করবেন—সেও আপনাদের মতন অনেক জানেশোনে।" এই কথা বলেই সে চলে গেলো।

ইন্‌ফাড়ুস্ যাওয়া মাত্রই আমি আর সবাইকে পাহাড়টা দেখিয়ে বললাম, "ঐ পাহাড়েই সলোমনের হীরের খনি আছে নিশ্চয়ই!"

উম্‌বোপা ওদের মাঝেই দাঁড়িয়ে সব শুনছিল। আমার কথা শুনেই তার ভাব জেগে উঠলো। জুলুতে সে বকতে সুরু করলে, "মাকুমাজাহন্, হীরে ওখানেই আছে—আপনারা সাদা আদমীর জাত, জীবনে খেলনা আর অর্থই ভালোবাসেন—হ্যাঁ, তাই মিলবে আপনাদের —তাই মিলবে।"

"তুই কেমন করে বুঝলি তা ?" আমি ভৎসনার স্বরে বলে উঠলাম। তার হেঁয়ালী ভরা কথা আমাদের মোটেই ভালো লাগছিল না।

"ওগো শ্বেত প্রভুরা, আমি এ স্বপ্নে দেখেছি।" বলে সে হাসতে হাসতে সরে গেলো।

স্যার হেনরী বললেন, "আমাদের কালো বন্ধুটির মতলব কি ? সে অনেক কিছুই জানে অথচ বলবে না তা তো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। যা হো'ক, কোয়াটার মেইন, ওকি আমার ভাইয়ের খবর কিছু জোগাড় করেছে ?"

"কিছু না ! যার সঙ্গে ওর এতটুকু মাত্র পরিচয় হয়েছে তার কাছেই ও আপনার ভাইয়ের কথা জিজ্ঞাসা করেছে বটে কিন্তু সবাই ঐ একই কথা বলে যে, কোন সাদা মানুষই এর আগে এদেশে তারা দেখেনি।"

গুড্ প্রশ্ন তুললো, "আপনার কি মনে হয় যে, তাঁর এদেশে আসা সম্ভব ? আমরা না হয় দৈবক্রমে এখানে এসে পৌঁচেছি, কিন্তু ম্যাপ্ ছাড়া তাঁর এখানে আসা কেমন করে সম্ভব হতে পারে ?"

"তা আমি বলতে পারি না।" স্যার হেনরী বিমর্ষ হয়ে পড়লেন, "তবে আমার মনে হয় তাকে আমরা খুঁজে বের করবোই।"

ধীরে ধীরে সূর্য অস্ত গেলো। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দেশটাও অকস্মাৎ যেন অন্ধকারে ঝুপ্ করে ডুবে গেলো।

আমাদের বিনয়ী বন্ধু ইন্ফাডুসের কথাতে সকলের চমক ভাঙলো। সে জানালে যে, বিশ্রাম শেষ হয়ে থাকলে, 'লু'র দিকে এবার যাত্রা করা যেতে পারে। চাঁদ উঠেছে। পথে দেরী হবার কোন কারণ নেই —পৌঁছেই আমরা নির্দিষ্ট কুটীরে রাত্রির মত বিশ্রাম করতে পারবো।

ঘন্টাখানেকের মধ্যেই আমরা সহরের প্রান্তদেশে এসে পৌঁছুলাম। মনে হলো শিবিরের আগুনে আগুনে সমস্ত নগরটা যেন ছেয়ে রেখেছে। আমরা একটা টানাসাঁকোর মুখে এসে দাঁড়ালাম। অস্ত্রের ঝন্‌ঝনির মাঝে ভারী গলায় আমাদের পরিচয় দাবী করা হলো। ইন্‌ফাদুস্‌ তাদের কি সাংকেতিক বাক্যে বললো বুঝলাম না, তবে রক্ষীরা সসম্মানে আমাদের পথ ছেড়ে দিলো। আমরা কুকুয়ানাদের আস্তানার ভিতরে ঢুকলাম। আরো আধ ঘন্টা আমাদের চলতে হলো। অসংখ্য কুটীর অতিক্রম করে আমরা অবশেষে গুঁড়ো চুন ছিটানো একটা উঠানের মাঝে কয়েকটা একসাথে লাগোয়া কুঁড়ের কাছে থামলাম। ইন্‌ফাদুস্‌ বললো এইগুলি আমাদের কুটীর।

আমরা দেখলাম আমাদের প্রত্যেকের জন্যে আলাদা আলাদা কুঁড়ে ঠিক করা হয়েছে। খাদ্য পানীয় সবই প্রস্তুত ছিল। আমরা খাওয়া দাওয়া করে সব বিছানাগুলো অনুরোধ করে—একঘরে আনিয়ে শুয়ে পড়লাম। একটানা দীর্ঘ পথ চলার পর অল্পক্ষণের মধ্যে গভীর ভাবে ঘুমিয়ে পড়লাম। যখন উঠলাম, সূর্য তখন অনেক ওপরে উঠেছে। আমাদের তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হতে বলা হলো। আমরা জামা কাপড় পরে তৈরী হলাম। প্রাতরাশের পর যখন ধূমপান করছি, ইন্‌ফাদুস্‌ স্বয়ং খবর নিয়ে এলো যে মহারাজ তওয়ালা আমাদের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য প্রস্তুত আছেন, আমরা এখন যেতে চাই কি না?

আমরা জানালাম যে, বেলা একটু না বাড়লে আর যাবো না। এতটা পথ হাঁটার জন্য এখনও ভারী ক্লান্তি বোধ করছি। আসলে, যদিও আমরা রাজা দেখবার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠেছিলাম, কিন্তু তাড়াতাড়ি করে আমাদের গরজ দেখাতে রাজী হলাম না। কারণ,

এতে জংলী লোকেরা সাধারণত ধরে নেয় যে, আগন্তুকেরা খুব অবাক হয়ে গেছে নয়তো বশ্যতা স্বীকার করেছে।

আমরা আরও ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম করলাম। ইতোমধ্যে ঠিক করা হলো যে ভেন্‌তেভোগেলের পরিত্যক্ত উইন্‌চেষ্টার রাইফেলটা রাজাকে আর বড়পুঁতি তার রাণীদের জন্য উপহার দেওয়া হবে। স্কাগ্‌গা আর ইন্‌ফাডুস্‌কে এর আগেই আমরা কিছু পুঁতি দিয়ে বুঝেছিলাম যে, এসব পেলে তারা ভারী খুশী হয়। সমস্ত ঠিক্‌ঠাক্‌ করে আমরা এবার সাক্ষাতের অভিপ্রায় প্রকাশ করলাম। ইন্‌ফাডুস্‌ আগে আগে পথ দেখিয়ে চললো।

কয়েক শ'গজ গিয়ে আমরা একটা ঘেরা জায়গায় পৌঁছুলাম। জায়গাটা কুড়ি একুশ বিঘের একটা মস্ত মাঠের মতন। ঘেরার বাইরে চারদিক দিয়ে ছোট ছোট অনেকগুলো কুটীরের সারি—সেগুলিই শুনলাম রাণীদের মহল। প্রবেশ পথের অপর প্রান্তে একেবারে মাঠ পেরিয়ে মহারাজের বিরাট কুটীর দেখতে পেলাম। সমস্ত মাঠটা জুড়ে চোখে পড়লো খালি দলকে দল কুকুয়ানা সৈন্য। সংখ্যায় প্রায় সাত আট হাজারের কম নয়।

মহারাজের কুটীরের সামনে খানিকটা খালি জায়গার ওপর গোটা-কতক টুল পাতা ছিল। ইন্‌ফাডুসের ইঙ্গিতে তারই তিনটের ওপর আমরা বসলাম। উম্‌বোপা আমাদের পিছনে দাঁড়িয়ে রইলো। ইন্‌ফাডুস্‌ কুটীরের দরজার সামনে আস্তানা নিলো! দশ মিনিট ধরে হাজার হাজার স্তব্ধ কৌতূহলী চোখের সামনে বসে থাকা সে এক ল্যাঠা! যা হোক কোন রকমে তা আমরা কাটিয়ে উঠলাম। অবশেষে কুটীরের দরজা খুলে গেলো। কাঁধের ওপর বাঘছালের চাদর ঝোলানো এক বিরাটাকার লোক ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। পিছনে পিছনে এলো

স্কাগগা আর সর্বাঙ্গ লোমের চাদরে ঢাকা একটা চিমড়ে মর্কটের মতন জীব। বিরাট লোকটা একটা টুলের ওপর আসন গ্রহণ করলে স্কাগ্গা গিয়ে তার পিছনে দাঁড়ালো। আর চিম্ড়ে মর্কটটা তার চার হাত পায়ে হামা দিয়ে চালের নীচে ছায়ায় উবু হয়ে বসলো।

চারদিকে সব চুপচাপ। সেই ভীমদর্শন লোকটা এবার উঠে দাঁড়িয়ে তার বাঘ ছালটা ফেলে দিলো। আমাদের মনে হলো চোখের সামনে যেন একটা রীতিমত ভয়ঙ্কর কিছুর আবির্ভাব হলো। ঐ রকম কুৎসিত দর্শন, বিরাট বিকট, চেহারার মানুষ জীবনে কখনও আর দেখিনি। নিগ্রোর মত তার পুরু ঠোঁট, থ্যাবড়া নাক আর একটা মাত্র জ্বলন্ত চোখ। দ্বিতীয় চোখ বলে আর কিছু নেই, মুখের ওপর সেই জায়গায় দেখা যাচ্ছিল শুধু একটা বীভৎস গর্ত। সমস্ত চোখে মুখে তার একটা নিষ্ঠুর হিংস্র লোলুপতা মাখানো। তার বিরাট মাথাটা থেকে চমৎকার লম্বা একটা উঠপাখীর পালক উঠে গেছে। গায়ে একটা ঝক্ঝকে লোহার চেনের জামা, কোমরে আর পায়ে তাদের জাতীয় চিহ্ন—সাদা ষাঁড়ের ল্যাজের বালা। হাতে ছিল তার একটা প্রকাণ্ড বর্শা, গলায় পুরু সোনার একটা হার। তার মাথায় বাঁধা একটুকরো মস্ত আকাটা-হীরে থেকে মৃদু দ্যুতি ঠিক্‌রে পড়ছিল।

একেই আমরা রাজা বলে আন্দাজ করলাম। লোকটা তার হাতের বর্শাটা উঁচু করে তুলে ধরতেই সামনের আট হাজার গলা থেকে রাজকীয় অভিবাদন গর্জে উঠলো, "কুম্"! তিন-তিনবার এমনি করে অভিবাদন ধ্বনি দেওয়া হলো। এদের গর্জনে প্রতিবারই মাটী শুদ্ধু যেন কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগলো।

"চুপ কর্—সবাই চুপ কর্। সামনে তোদের রাজা।" সরু

গলায় আওয়াজ শুনে মনে হলো, আওয়াজটা ছায়ায় বসা মর্কটটার গলা থেকে বেরুচ্ছে।

এরপরই সকলের কণ্ঠ একদম নিস্তব্ধ হয়ে গেলো। কুটো পড়লে তার শব্দও শোনা যায় এমনি মনে হতে লাগলো। এমন সময় হঠাৎ আমাদের বাঁদিকে একটি সৈনিকের হাত থেকে ঢাল পড়ে যাওয়ায় সেই নিস্তব্ধতা খান্ খান্ হয়ে ভেঙে গেলো।

তওয়ালার নিষ্ঠুর চোখ সেই দিকে ঘুরে গেলো। নিষ্প্রাণ কণ্ঠে সে বলে উঠলো, "এ্যাই—এখানে আয়!"

একটি বলিষ্ঠ যুবক দল থেকে তার সামনে এসে দাঁড়ালো।

"তোর ঢাল পড়েছে—হারামজাদা কুত্তা! তারার দেশের লোকের সামনে আমাকে অপদস্থ করতে চাস্, এ্যাঁ? বল ব্যাটা কি বলতে চাস, বল্?"

আমরা বেশ স্পষ্ট দেখতে পেলাম, বেচারা একেবারে বিবর্ণ হয়ে গেছে। সে ক্ষীণ কণ্ঠে বলে উঠলো, "দৈবাৎ হাত থেকে খসে গেছে মহারাজ!"

"বেশ, দৈবাতের মূল্যই তোকে দিতে হবে। তুই আমাকে অপদস্থ করেছিস। মৃত্যুর জন্যে তৈরী হ'।"

"স্ক্রাগ্‌গা," মহারাজ হুঙ্কার দিয়ে উঠলো, "দেখি কেমন বর্শা ছুড়তে শিখেছিস। উজবুক কুত্তাটাকে মেরে দে দেখি।"

স্ক্রাগ্‌গা বিশ্রী মুখভঙ্গী করে এগিয়ে এসে শূন্যে বর্শা তুলে ধরলো। অপরাধী বেচারী দু'হাতে মুখ ঢেকে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ালো। ভয়ে আমরা স্তম্ভিত হয়ে উঠলাম।

"এক—দুই"—শূন্যে স্ক্রাগ্‌গার বর্শা ফলক দুলে উঠলো, তারপর—আঃ—!

বর্শাটা সোজা গিয়ে সৈনিকটির পিঠ ফোঁড়ে এক ফুট মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে গেলো। লোকটা হাত দুটো একবার আকাশে মেলে দিয়ে ধপ্ করে পড়ে গেলো। সঙ্গে সঙ্গে আশে পাশের জনতার মধ্য থেকে একটা অস্পষ্ট গুঞ্জন উঠে ধীরে ধীরে মিলিয়ে এলো। সামনেই দেহটা পড়েছিল—আমরা ভাবতেই পারছিলাম না যে, এই মাত্র এমন একটা কাণ্ড ঘটে গেলো। স্যার হেনরী দাঁড়িয়ে উঠলেন—তারপর চতুর্দ্দিকের নিস্তব্ধতায় অভিভূত হয়ে আবার বসে পড়লেন।

"সাব্বাস্! খুব ভালো বর্শা ছোঁড়া হয়েছে।" রাজা মন্তব্য করলেন, তারপর হেকে উঠলেন "নিয়ে যা এখান থেকে।"

সৈন্যদের মধ্য থেকে চারজন এগিয়ে এসে মৃতদেহটাকে সরিয়ে নিয়ে গেলো।

মর্কটমার্কা মূর্তিটা কেঁউ কেঁউ করে উঠলো, "রক্তের দাগ ঢেকে ফ্যাল—ঢেকে ফ্যাল! রাজার বিচার শেষ হয়ে গেছে।"

কথা শুনে একটি মেয়ে এক কলসী গুঁড়ো চুণ নিয়ে এসে রক্তের ওপর ছড়িয়ে দিলো। চূণের গুড়ো সমস্ত রক্তের দাগ ব্লটিংয়ের মতন শুষে নিলো।

স্যার হেনরী এতক্ষণ রাগে একেবারে ফুলছিলেন, তাঁকে সামলানো আমাদের পক্ষে কষ্টকর হয়ে উঠলো।

"ভগবানের দোহাই, আপনি বসুন," আমি তাঁর কানে কানে বললাম, "বুঝছেন না, চুপ করে থাকার ওপরই আমাদের জীবন নির্ভর করছে।"

আমার কথায় তিনি শান্ত হয়ে বসলেন।

তওয়ালা এতক্ষণ চুপ করে বসেছিল। এই নিদারুণ হৃদয় বিদারক ঘটনার শেষ চিহ্নটি পর্যন্ত মুছে গেলে আমাদের উদ্দেশ্য করে সে বলে

উঠলো, "সাদামানুষেরা তোমরা কেমন করে এসেছো জানি না, কেন এসেছো তাও জানি না—তবুও নমস্কার জানাচ্ছি।"

আমি উত্তর দিলাম, "নমস্কার কুকুয়ানা-সম্রাট।"

"সাদামানুষেরা তোমরা কোথা থেকে এসেছো, কি চাই তোমাদের ?"

"আমরা তারার দেশ থেকে আসছি। কেমন করে এলাম সে কথা আর জিজ্ঞাসা নাই করলে। আমরা এসেছি তোমাদের দেশ দেখতে।"

"এইটুকু একটা জিনিস দেখতে অনেক দূর থেকে আসছো তোমরা। তোমাদের সঙ্গে ঐ লোকটা—" উম্‌বোপাকে দেখিয়ে তওয়ালা বললো, "ও-ও কি তারার দেশ থেকে আসছে না কি ?"

"হাঁ তাই, সেখানে তোমাদের মতন লোকও আছে। মহারাজ তওয়ালা সে সব তোমার বুদ্ধির অগম্য, সে সব কথা তোমার না শোনাই ভালো।"

"হুঁ, তারার দেশের মানুষ বড় লম্বা লম্বা কথা বলে দেখছি !" এমনভাবে তওয়ালা উত্তর দিলো যে, তার ভঙ্গী আমার মোটেই ভালো লাগলো না। "মনে রেখো, তোমরা আছো এখানে আর তারা আছে অনেক—অনেক দূরে। যে লোকটাকে এইমাত্র নিয়ে গেলো, তোমাদের অবস্থাও যদি ওর মতন করি তো কি হয়, এ্যাঁ ?"

"সাবধান রাজা !" আমি বললাম, "তপ্ত পাথরে পা দেবার আগে পা সামলে নিও নইলে তোমারও পা পুড়তে পারে। আমরা অনেক দূরের থেকেও মরণকে ডেকে আনতে পারি, সে কথা কি তুমি শোন নি ?"

"ওরা সে কথা আমাকে বলেছে বটে, তবে আমি তা বিশ্বাস করি না। সামনে যে মানুষগুলো দাঁড়িয়ে তার একটা মেরে দেখাও দেখি।"

"না", আমি উত্তর করলাম, "বিনা কারণে আমরা মানুষের রক্তপাত করিনে। তবে তোমার যদি একান্ত ইচ্ছে হয়ে থাকে, তুমি একটা লোককে এই প্রাঙ্গণের মধ্যে একটা ষাঁড় তাড়িয়ে নিয়ে আসতে বলো, তারপর দেখো ফটক্ থেকে দশ পা এগুতে না এগুতে আমি তাকে মেরে শুইয়ে দিচ্ছি।"

লোকটা হো-হো করে হেসে উঠে বললো, "যদি মানুষ মেরে দেখাতে পারো তো বিশ্বাস করি, নইলে নয়।"

"ভালো, তাই হোক" আমি ঠাণ্ডা মেজাজে জবাব দিলাম, "তাহলে মহারাজ, তুমিই এই উন্মুক্ত পথ দিয়ে হাঁটো তারপর দেখো ঐ ফটকের কাছে পেঁছুবার আগেই তোমায় শেষ করতে পারি কি না? তবে তোমার যদি নেহাৎ মত না থাকে তবে তোমার ঐ সুপুত্তুর স্কাগ্‌গাকে পাঠাতে পারো।" ওকে মারার জন্য তখন আমার হাতটা ভারী নিশ্‌পিস্ করছিল।

আমার কথা শুনে স্কাগ্‌গা জানোয়ারের মতন চেঁচিয়ে উঠলো। তারপর এক ছুটে ঘরে ঢুকে খিল এঁটে দিলো।

ভীষণ ভ্রূভঙ্গী করে তওয়ালা একটা ছোট ষাঁড় তাড়িয়ে আনার আদেশ দিলো। দু'জন লোক সে হুকুম তামিল করার জন্য তক্ষুনি ছুটে বেরিয়ে গেলো।

আমি স্যার হেনরীকে বললাম, "এইবারটা আপনি বন্দুক ধরুন। কারণ, আমি বদমাস্‌টাকে দেখাতে চাই যে দলের মধ্যে আমিই খালি ভেল্কী দেখাতে জানি না।"

স্যার হেনরী দোনলা এক্সপ্রেস রাইফেলটা তুলে নিলেন।

একটু বাদেই দূরে ফটকের সামনে একটা ষাঁড়কে আমাদের দিকে আসতে দেখতে পেলাম। গেট দিয়ে ষাড়টা ঢুকেই এতোগুঁলো লোক দেখে থম্‌কে ঘুরে দাঁড়িয়ে হাঁক পাড়তে লাগলো।

আমি ফিস্‌ফিসিয়ে উঠলাম, 'এইবার—'

রাইফেলটা ওপরে উঠে গেলো, তারপর 'গুড়ুম' করে একটা আওয়াজ হলো। দেখতে পেলাম ষাঁড়টা মাটিতে পড়ে পা আছড়াচ্ছে। গুলিটা তার পাঁজরা ভেদ করে চলে গেছে। উপস্থিত জনতার মধ্য থেকে একটা বিস্ময়ের নিঃশ্বাস বেরিয়ে এলো।

আমি ধীরভাবে বললাম, "কি আমার কথা মিথ্যে মনে হয়, তওয়ালা ?"

তওয়াল বিস্ময়ে হতবাক হয়ে উত্তর করলো, "না—সত্য কথাই বলেছো সাদামানুষ।"

আমি বলতে লাগলাম, "আমাদের শক্তি তো দেখলে তওয়ালা। তবু বলি শোনো, আমরা এখানে লড়াই করতে আসিনি, সদ্ভাব নিয়েই এসেছি।" তারপর ভেন্‌তেভোগেলের রাইফেলটা হাতে করে বললাম, "দেখছো ফাঁপা জিনিসটা—এটা দিয়ে আমাদের মতই তুমিও মারতে পারবে ; তবে এর ওপর মন্তর পড়ে দিচ্ছি যে, এদিয়ে তুমি কোন মানুষ মারতে পারবে না। তা যদি করো, তা হলে এই নলই তোমাকে হত্যা করবে।"

রাইফেলটা তার হাতে দিয়ে আবার বললাম, "তওয়ালা এই মন্ত্রপূত নলটি এবার তোমার হলো। কেমন করে এ ব্যবহার করতে হয় পরে তা শিখিয়ে দেবো। কিন্তু সাবধান, তারার রাজ্যের যাদুকে মাটির দেশের মানুষের ওপর প্রয়োগ করতে যেয়ো না।"

রাজা মশাই খুব সন্তর্পনে রাইফেলটি গ্রহণ করে পায়ের কাছে রেখে দিলেন। সেই সময় মর্কটের মতন জীবটা হামা দিয়ে দাঁড়িয়ে তার মুখের ওপর থেকে লোমের চাদরটা খুলে ফেলে দিতেই সঙ্গে সঙ্গে সেখানে একটা কুৎসিত ডাইনীর মুখ ভেসে উঠলো। চেহারা দেখেই মনে হলো তার বয়সের গাছপাথর নেই। সারা মুখে তার হল্‌দে হল্‌দে ভাঁজ করা করা চামড়ার দাগ। সেই ভাজের মাঝে একটা ছিদ্রের আভাষ কোন রকমে তার মুখ-গহ্বরের অস্তিত্ব ঘোষণা করছিল। নাক বলে তার কোন বস্তু ছিল না বললেই হয়। তার সাদা ভুরুর নীচে একজোড়া জলন্ত শয়তানী চোখের চাঞ্চল্য না থাকলে, তাকে রোদে পোড়া আম্‌সি লাস বললেও কিছু ক্ষতি ছিল না। মাথা বলতে তার ছিল একটা টাকপড়া হলদে রংয়ের ভাঁজ পড়া খুলি। সাপের ফণার মতই সেটা ফূঁসে ফূঁসে উঠছিল।

তার বীভৎস মূর্তি দেখে আমাদের গা কেমন শির্ শির্ করতে লাগলো। মূর্তিটা কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে তার ইঞ্চি খানেক করে লম্বা নখওয়ালা চামড়ার থাবা রাজার কাঁধের ওপর বসিয়ে দিয়ে ক্ষীণ কর্কশ কণ্ঠে বলে উঠলো, "শোন! ওরে রাজা শোন! শোন সেপায়ে'র দল, শোন! ওরে আমার উপর ভূত ভর করে, আমি ভবিষ্যৎ বাণী করে যাচ্ছি, শোন! শোন! শোন!

"রক্ত! রক্ত! রক্তের নদী! রক্তের নদী! দেখতে পাচ্ছি! গন্ধ পাচ্ছি! সোয়াদ পাচ্ছি—নোন্‌তা রে নোন্‌তা! মাটির ওপর দিয়ে রাঙা হয়ে বয়ে যাচ্ছে, আকাশ থেকে বৃষ্টি হয়ে ঝরছে।

"পায়ের শব্দ আসছে! আসছে—আসছে! বহু দূর থেকে সাদা-মানুষের পায়ের শব্দ আসছে। পৃথিবী নড়ে উঠছে।

"আমি বুড়ী হয়েছি—অনেক রক্ত দেখেছি। হাঃ—হাঃ—হাঃ! আরো দেখবো, খুশী হবো, তবে মরবো। আমি দেখেছি—দেখেছি ঐ সাদামানুষদের। জানি ওদের বাসনা। আমি বুড়ো হয়েছি কিন্তু আমার চেয়েও বুড়ো আছে ঐ পাহাড়, বল ওরে তোরা বল, ঐ বড় রাস্তা করেছে কে? পাহাড়ে পাহাড়ে ছবি এঁকেছে কে? গুহা-গহ্বর পাহারা দিতে ঐ তিন মৌনী দেবতাকে কে রেখেছে?" এই কথা বলে সে আমাদের দেখা গত রাতের তিনটি পাহাড়ের দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে দিলো।

"জানিস্ না তোরা জানিস না, কিন্তু আমি জানি। একদল সাদা-মানুষ। তোরা যখন ছিলিনা, তখন তারা ছিল। তোরা যখন থাকবি না, তারা থাকবে। তারা তোদের খাবে—শেষ করবে। ইয়া! ইয়া—ইয়া!

"কেন এসেছিল তারা? ঐ সব সাঙ্ঘাতিক সাদামানুষের দল কেন এসেছিল? তোর মাথায় জ্বল্ জ্বলে কিসের পাথর জ্বলে রাজা? তোর বুকে কার তৈরী লোহার জামা ঝল্মল্ করে? তুই তো জানিস নে রাজা, আমি—আমি বুড়ীর বুড়ী, সব-জান্তা ইসানুসী—ডান শিকারী সব জানি!"

তারপর সে শকুনীর মতন কেশহীন মাথাটা আমাদের দিকে ঘুরিয়ে আবার স্থুরু করলো, "ওরে সাদামানুষের দল, তারার দেশের, তোরা কি চাস? হেথায় কি চাস? ও, তোরা তোদের হারানো লোককে খুঁজতে এসেছিস? নেই সে এখানে নেই। ওরে সেই একবারই এসেছিল সাদামানুষ এদেশে। মরেছে—সে মরেছে, ফিরতে হয়নি তাকে। তোরা ঐ ঝক্মকে পাথর নিতে এসেছিস, এ্যা—জানি, আমি জানি। হ্যাঁ তোরা তা পাবি; যখন রক্ত শুকিয়ে খট্খটে হয়ে

উঠবে ? তখন পাবি। ওরে এখনও দেখ, ফিরবি না মরবি ? হিঃ—হিঃ—হিঃ !”

“আর তুই কালা চামড়া, মরদের বাচ্চা !” উমবোপাকে লক্ষ্য করে সে বলতে লাগলো, “কে তুই—কি চাস ? তুই তো ঝক্‌মকে পাথর চাস না—হল্‌দে লোহা চাস না—তবে ? ওঃ ! জানি তোকে জানি , বোধ হচ্ছে তোর রক্তের গন্ধ আমার নাকে আসছে। খোল্ —তোর মুচা খোল্—”

বলতে বলতে সেই অদ্ভুত বুড়ী উত্তেজনায় মাটিতে পড়ে হাত পা খিঁচুতে আরম্ভ করলো। মৃগী রোগীর মতন মুখ দিয়ে তার ফেনা উঠতে লাগলো। ধরাধরি করে তাকে সবাই ঘরের মধ্যে নিয়ে গেলো।

রাজা তওয়ালা কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়িয়ে তার হাত নাড়লো। সঙ্গে সঙ্গে সৈন্যরা সার বেঁধে চলে যেতে সুরু করে দিলো। দশ মিনিটের মধ্যে রাজা ও রাজার সহচর আর আমরা কয়েকজন ছাড়া সেই বিরাট প্রাঙ্গনটা একদম খালি হয়ে গেলো।

“সাদামানুষের দল,” তওয়ালা বলতে লাগলো, “গাগুল যা বললে, তাতে আমার মন চাইছে তোমাদের একেবারে শেষ করে ফেলতে।”

আমি হেসে উঠলাম। বল্লাম, “দেখো রাজা আমাদের শেষ করা অত সহজ নয়, ষাঁড়ের দশাতো নিজের চোখে দেখেছো ; তুমি কি ষাঁড়ের পথে যেতে চাও ?”

রাজা ভ্রূভঙ্গী করে উঠলো, “রাজাকে শাসানো ভালো নয়।”

“আমরা শাসাচ্ছি না, যা সত্য তাই বলছি। আমাদের হত্যা করার চেষ্টা করলে সেই মত ফলও পাবে।”

দুর্দান্ত জংলীটা মাথায় হাত রেখে কি ভাবলে তারপর বলে উঠলো, "আচ্ছা, এখন ভালোয় ভালোয় যেতে পারো, আজকে রাতে আমাদের নৃত্যোৎসব, তোমাদের নিমন্ত্রণ রইলো। ভয় নেই আজকে আমি কোন রকম মতলব আঁটবো না—সে কথা ভাবি যদি, কাল ভাববো।"

যেন কিছুই হয়নি এইভাবে, "সেই ভালো" বলে আমরা ইন্‌ফাহুসের সঙ্গে আমাদের নির্দিষ্ট কুটীরের দিকে পা বাড়ালাম।

ডাইনী শিকার

কুটীরে পৌঁছে আমি ইন্‌ফাতুস্‌কে ভিতরে আসতে ইঙ্গিত করলাম।

"দেখো ইন্‌ফাতুস্‌," আমি বললাম, "তোমার সঙ্গে আমাদের কয়েকটা কথা আছে।"

"বলুন হুজুর।"

"তওয়ালাকে খুব নিষ্ঠুর রাজা বলে আমাদের মনে হচ্ছে।"

"যথার্থ প্রভু। সমস্ত দেশ তার অত্যাচারে জর্জরিত। আজকের রাতে আপনারা তা দেখতে পাবেন। এই উৎসবে, ডাইনী সন্দেহ করে শুধু শুধু অনেককেই হত্যা করা হবে। আমিও হয়তো মরতে পারি। এতোদিন মরিনি তার কারণ বীর বলে আমার একটু নাম ডাক আছে আর সৈন্যরাও আমাকে সবাই ভালোবাসে। তবে জানি না আর নিস্তার পাবো কিনা। সমস্ত দেশ তওয়ালার স্বৈরাচার এবং হত্যাকাণ্ডে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে।

"তবে লোকেরা বিদ্রোহ করে না কেন?"

"তা হয় না প্রভু, সে যে রাজা—সে যদি মরে তার বদলে রাজা হবে তার ছেলে স্কাগ্‌গা। বাপের এক কাটি ওপর দিয়ে যায় ছেলে। হ্যাঁ, এই অত্যাচারের প্রতিবিধান হতো, যদি না মরতো ইমোতু বা যদি বেঁচে থাকতো তার ছেলে ইগ্‌নোসি। কিন্তু কেউই বেঁচে নেই।"

"কেমন করে তুমি জানলে যে ইগ্‌নোসি মরেছে!" আমাদের পিছন থেকে আওয়াজ হলো। অবাক হয়ে ফিরে দেখতে গেলাম কে কথা বলে, দেখি উম্‌বোপা।

"তুই আবার কি বলিস্‌রে বেটা?" ইন্‌ফাডুস্‌ বলে উঠলো. "তোকে কে কথা বলতে বলেছে?"

"শোনো ইন্‌ফাডুস্‌" সে উত্তর করলো, আমি এক গল্প বলি। তোমরা তো জানো যে, রাজা ইমোতু মারা গেলে রাণী তার শিশুপুত্র ইগ্‌নোসিকে নিয়ে পালিয়ে গেছে। আর সবাই জানে যে, মা আর ছেলে দু'জনেই ঐ পাহাড়ে মরেছে। তাই না?"

"হ্যাঁ তাই!"

"কিন্তু ঘটনা চক্রে মা বা ছেলে কেউই মরেনি। তারা ঐ পাহাড় পেরিয়ে এক মরু-বেদের দলে গিয়ে পড়ে। তাদের সঙ্গে মরুভূমি পেরিয়ে আবার তারা সবুজ মাটির দেশে পৌঁছোয়।"

"তুই কেমন করে জানলি?"

"শোনো। তারপর অনেক দেশ ঘুরে ঘুরে তারা কুকুয়ানাদের জ্ঞাতি, আমজুলুদের দেশে আসে। সেখানে অনেকদিন থাকার পর ছেলে মানুষ করে মা মরে যায়। তারপর ইগ্‌নোসি অনেক দেশ দেখে, অনেক কিছু শেখে।"

অবিশ্বাসের সঙ্গে ইন্‌ফাডুস্‌ মন্তব্য করে, "বেড়ে গল্প বানাতে পারে।"

উম্‌বোপা বলে চলে "দীর্ঘদিন অপেক্ষা করবার পর ইগ্‌নোসি এই সাদামানুষদের দেখা পায়। তাদের সঙ্গে সে মরু-কান্তার, পাহাড়-পর্বত ডিঙিয়ে কুকুয়ানাদের দেশে এসে তোমার দেখা পেয়েছে ইন্‌ফাডুস্‌।

বৃদ্ধ সৈনিক বিস্ময়াভিভূত হয়ে বলে উঠলো, "আরে বলে কি, এদেখি একেবারে বাউড়া বনে গেছে।"

"তাই কি তোমার মনে হচ্ছে কাকা ? বেশ আমি দেখাবো—আমিই ইগ্‌নোসি—কুকুয়ানাদের যথার্থ আইন সম্মত রাজা।" এই কথা বলে এক ঝট্‌কা মেরে উম্‌বোপা তার কটিবাস উন্মোচন করে ফেললো।

আমরা বিস্ময়ে অবাক হয়ে দেখলাম যে, উম্‌বোপার সারা পেট জুরে রয়েছে মস্ত একটা সাপের আঁকাবাঁকা উল্কি। উরু আর দেহের সংযোগ স্থলে সাপটা ল্যাজের অগ্রভাগ তার মুখের মধ্যে পুরে দিয়ে মিলিয়ে য'চ্ছে।

ইন্‌ফাদুসের চোখদুটো যেন তার অক্ষিকোটর থেকে বেরিয়ে আসতে লাগলো। সে হাঁ করে দেখতে দেখতে, "কুম্!" বলে হাঁটু গেড়ে মাটিতে বসে পড়ে অস্পষ্ট ভাবে বলে উঠলো, "আমার ভাইয়ের ছেলে, এই তো রাজা, আমার রাজা !"

"এই কথাই কি তোমায় আমি বলিনি কাকা ? ওঠো, এখনও আমি রাজা হইনি, তবে তোমার আর আমার বন্ধু এই সাদামানুষদের সাহায্য পেলে আমি রাজা হবো। এখন বলো ইন্‌ফাদুস্ তুমি কি আমার সঙ্গে হাত মেলাবে ? আমার বিপদে অংশভাগী হয়ে সেই অত্যাচারী খুনে শয়তানটাকে কি রাজার আসন থেকে টেনে নামাবে, না অন্যপথ বেছে নেবে ?"

ইন্‌ফাদুস্ উম্‌বোপার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে তার হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বলতে লাগলো, "ইগ্‌নোসি, কুকুয়ানাদের ধর্মরাজা, তোমার হাতে আমার হাত সঁপে দিলাম—আজীবন আমি তোমার দাসানুদাস।"

"ওঠো কাকা যদি আমি সাফল্য লাভ করি, তবে রাজার পরই তুমি হবে দেশের সবচেয়ে বরণীয় ব্যক্তি আর যদি অকৃতকার্য হই, তবে মৃত্যুই হবে তোমার একমাত্র আশ্রয়।

"আর হে সাদামানুষের দল, তোমরা কি আমাকে সাহায্য করবে? যদি করো প্রতিদানে তোমাদের কী-ই বা দিতে পারবো? হ্যাঁ, সাদা পাথর! যদি আমি জয়ী হই, আর যদি আমি তা খুঁজে বের করতে পারি, তবে কথা দিচ্ছি, যত তোমরা সে পাথর নিয়ে যেতে চাও তত নিয়ে যেতে পারবে। এই প্রতিশ্রুতি কি যথেষ্ঠ হবে না?"

তার কথা আমি অনুবাদ করে সকলকে শোনালাম স্যার হেনরী উত্তর করলেন, "ওকে বলো যে, ও এখনও আমাদের চিন্‌তে পারেনি। সম্পদ ভালো। আর পথে যদি তা পাই আমরা গ্রহণও করবো, কিন্তু সম্পদের বিনিময়ে ভদ্রসন্তান আত্মবিক্রয় করে না। উম্‌বোপাকে আমার গোড়া থেকেই ভালো লেগেছে, তাই আমার দিক থেকে আমি কথা দিচ্ছি যে, এই কাজে তার পাশে আমি দাঁড়াবো। আমার ভারী ইচ্ছে যে, ঐ শয়তান তওয়ালার সঙ্গে একেবারে হিসেব নিকেশ শেষ করে যাই। গুড্‌, কোয়াটার মেইন, তোমাদের মত কি?"

আমরাও তাঁর মতে মত দিলাম। তবে আমি এই কথা ইগ্‌নোসিকে জানিয়ে দিলাম যে, আমরা এ পথে এসেছি স্যার হেনরীর ভাইয়ের সন্ধানে। এ কাজে তাকে আমাদের অবশ্যই সাহায্য করতে হবে। আমার কথা শুনে সে উত্তর করলো, "তা আমি নিশ্চয় করবো।" তারপর ইন্‌ফাদুস্‌কে ডেকে জিজ্ঞাসা করলো, 'আচ্ছা, ইন্‌ফাদুস্ আমার পবিত্র সর্পচিহ্নের নামে শপথ নিয়ে সত্যি করে বলো তো, কোনো সাদা-মানুষের এদেশে আসার কথা তুমি শুনেছো কি?"

"কারুর কথাই শুনিনি ইগ্‌নোসি!"

"যদি কোন সাদামানুষের এতটুকু হদিস এদেশে পাওয়া যেতো তা হলে তার কথা অবশ্যই তোমার কানে আসতো কেমন ?"

"নিশ্চয়ই !"

"শুনলেন তো ইন্‌কুবু," স্যার হেনরীকে উদ্দেশ্য করে উম্‌বোপা বললো, "সে এদেশে আসেনি।"

স্যার হেনরী একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন, "হবে, হয়তো সে দেশের এ অঞ্চলে পৌঁছুতে পারেনি। যাক ভগবানের ইচ্ছাই পূর্ণ হবে !"

এই দুঃখপূর্ণ আলোচনা তাড়াতাড়ি চাপা দেবার জন্য আমি অন্য কথা পাড়লাম। "দেখো ইগ্‌নোসি, দেবানুগ্রহে রাজার বংশধর হওয়া সোজা কিন্তু আসলে তুমি রাজা হচ্ছো কেমন করে ?"

তার খুড়ো ইন্‌ফাদুস্ তার জবাব দিলো যে আজকের রাতে নৃত্যোৎসবে পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডের পর যখন অনেক সর্দারেরই মন ক্ষুব্ধ হয়ে থাকবে, তখন তাদের সঙ্গে কথা বলে তাদের সৈন্য সমেত স্বপক্ষে আনবার চেষ্টা করা হবে। যদি সে সফল হয় তবে ইগ্‌নোসির জন্যে কম পক্ষে বিশ হাজার বর্শাধারী সৈন্য সে কাল সকালেই জোগাড় করে ফেলবে। এ কাজে লড়াই ছাড়া গতি নেই।

এমন সময় রাজার উপঢৌকন আসাতে আমাদের পরামর্শ সভা ভাঙতে হলো। আমরা ধন্যবাদ জানিয়ে উপঢৌকন গ্রহণ করলাম। তারপর রাজদূতকে বিদায় দিয়ে সেগুলি দেখতে লাগলাম। লোহার জালের তৈরী তিনটে খুব ঝক্‌ঝকে বক্ষাবরণ আর চমৎকার তিনখানি কুড়াল। লোহার জালের ওমন কাজ কখনও আমরা এর আগে দেখিনি। একটি জামার আকারে জালটি এমন ভাবে লোহার

চেনে গাঁথা যে, একসাথে করলে দু'হাতের মুঠোর মধ্যে অনায়াসেই তা ধরা যায়।

"তোমরা কি এদেশে এসব তৈরী করো ইন্‌ফাদুস্?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "ভারী চমৎকার তো!"

"না প্রভু, এগুলো আমরা উত্তরাধিকারী সূত্রে পেয়েছি। আমরা জানিনা কারা এগুলি তৈরী করেছিল। এর অল্পই আর অবশিষ্ট আছে। একমাত্র রাজবংশের লোকেরাই এগুলি পরতে পারে। এগুলি মন্ত্রপূত পরিচ্ছদ। বর্শা একে বিঁধতে পারে না। যারা এগুলো পরে যুদ্ধে যায় তারা বেশ নিরাপদেই থাকে। রাজা নিশ্চয়ই হয় খুব খুসী হয়েছে, না হয় খুব ভয় পেয়েছে। তা না হলে এই লোহার জামা পাঠাতো না। আজকের রাতে আপনারা এগুলি পরে যাবেন।"

সমস্ত দিনটা আমরা নিশ্চিন্তে কাটালাম। সূর্য অস্ত গেলে প্রহরীদের হাজারো মশাল জ্বলে উঠলো। সেই অন্ধকারে আমরা শুনতে পেলাম হাজার হাজার সৈন্যের পদধ্বনি আর বর্শার ঝন্‌ঝনি। সবাই উৎসবে যাচ্ছে। আস্তে আস্তে পূর্ণ চন্দ্রের উদয় হলো। ইন্‌ফাদুস্ পূর্ণ সৈনিকের বেশে বিশ জন প্রহরী নিয়ে আমাদের নৃত্যোৎসবে নিয়ে যেতে এলো। তার কথামত আমরা রাজার দেওয়া উপহার গায়ে পরে নিলাম। তারপর কোমরে আমাদের রিভলবারগুলো বেঁধে নিয়ে সেই লড়ায়ে কুড়ুল হাতে করেই রওনা দিলাম।

সকালে যে অঙ্গনে রাজার সঙ্গে দেখা করেছিলাম সেই মাঠেই গিয়ে উপস্থিত হলাম। দেখলাম যে এবারে অন্তত বিশ হাজার সৈন্যে প্রাঙ্গণটা ভরে উঠেছে।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "আচ্ছা ইন্‌ফাডুস্ আমরা কি বিপদের মধ্যে পড়েছি ?"

"তা আমি বলতে পারি না প্রভু, বিশ্বাস হয় না-ই। তবে ভয় পেয়েছেন এমন ভাব দেখাবেন না। আজকের রাত ভালোয় ভালোয় কাটলে সব ভালোর দিকেই যেতে পারে। রাজার বিরুদ্ধে সৈন্যদের মধ্যে প্রতিবাদ শোনা যাচ্ছে।"

আমরা কথা বলতে বলতে প্রাঙ্গণের মধ্য ভাগের দিকে এগিয়ে চললাম। এখানে কতকগুলো টুল পাতা ছিল। চলতে চলতে দেখতে পেলাম রাজার কুটীরের দিক থেকে একটি দল আসরের এই দিকেই আসছে।

''রাজা তওয়ালা, তার ছেলে স্ক্রাগ্‌গা, বুড়ী গাগুল আর ওদের সঙ্গে যাদের দেখতে পাচ্ছেন ওরা হলো জল্লাদ।" এই কথা বলে, ইন্‌ফাডুস্ প্রায় জন-বারো বিরাট ও ভীষণাকৃতির একটি দলকে দেখিয়ে দিলো। তাদের এক হাতে বর্শা আর এক হাতে ভারী মুষল।

রাজা মাঝের টুলে আসন গ্রহণ করলো। গাগুল গুঁড়ি মেরে তার পায়ের কাছে বসলো। বাকী সকলে তাদের পিছনে গিয়ে দাঁড়ালো।

"নমস্কার শ্বেতপ্রভুর দল !" তওয়ালা আমাদের দেখে জোর গলায় বলে উঠলো, "বসো বসো, সময় নষ্ট করে আর কাজ নেই—সারা রাতেও আমাদের সব কাজ শেষ হবে না। তোমরা ঠিক সময় এদেশে এসেছো, আজকে এক চমৎকার খেলা দেখবে তোমরা।"

"সুরু কর! সুরু কর!" গাগুলের গলা থেকে ফাটা বাঁশীর মত ক্ষীণ কর্কশ ধ্বনি উঠলো, "হায়নাদের ভুক্ লেগেছে, তারা খাবারের জন্যে চিল্লাচ্ছে। সুরু কর, সুরু কর!"

রাজা তার বর্শা তুলতেই, বিশ হাজার পা মাটি থেকে ওপরে উঠে গিয়ে একসাথে ধপ করে ভূমিতে আঘাত হান্‌লো। পদাঘাতে পায়ের তলার শক্ত মাটি কেঁপে কেঁপে উঠলো। তারপর সেই দর্শকমণ্ডলীর সুদূর এক কোনের একটি গলা থেকে শোক সূচক একটি গানের সুর ভেসে এলো। তাঁর শেষকলি কতকটা এই রকম—

নারীর গর্ভে জন্মে বটে
নরের কপালে কি-সে ঘটে ?

সেই বিশাল জনতার প্রতিটি কণ্ঠ থেকে উত্তর এলো, "মরণ !"

ক্রমে ক্রমে দলের পর দল সেই একই গান গাইতে আরম্ভ করলো। অবশেষে দেখা গেলো, অস্ত্রধারীরা সবাই সমবেত কণ্ঠে সেই গান গেয়ে চলেছে। গানের কথা আর আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না, সব একাকার হয়ে যেতে লাগলো। খালি মনে হলো তারা যেন মানুষের সুখ দুঃখের কথা বলছে।

সমস্ত জায়গাটার ওপর একটা নিস্তব্ধতা নেমে এলো। রাজার হাতের ইঙ্গিতে আবার সেই স্তব্ধতা ভেঙে গেলো। পর মুহূর্তেই আমরা কতকগুলো পায়ের খস্‌খস্‌ শব্দ শুনতে পেলাম। দেখলাম যে, সেই বিরাট সৈন্যদলের মাঝ থেকে কয়েকটা অদ্ভুত মূর্তি আমাদের দিকে আসছে। কাছে এলে বুঝতে পারলাম মূর্তিগুলো স্ত্রীলোকের। মাছের পট্‌কা লাগানো পাকা-পাকা চুল তাদের পিছনে উড়ছে। লম্বা লম্বা হলদে আর সাদা দাগ আঁকা তাদের মুখে। কাঁধের ওপর পিঠের দিকে সাপের চামড়া ঝুলছে। কোমরে মানুষের হাড়ের মালা ঝুম্‌ ঝুম্‌ করে বাজছে। চামড়া কোঁচকানো হাতে তারা একটা করে কাঁটার মতন যাদুর-কাঠি ধরে আছে। আমাদের সামনে এসে তারা থেমে

গেলো। তারপর একজন গাগুলের দিকে লক্ষ্য করে কাঠি উঁচিয়ে বলে উঠলো "মাগো! বুড়ী মা আমরা এসেছি।"

"তা বেশ! বেশ! বেশ!" সেই বিকটা বুড়ী বলে উঠলো, "ওলো তোদের নজর কেমন লো ইসানুসিরা (অর্থাৎ, ডাইনীর মেয়ে রোঝা) ? আঁধারে নজর চলে তো ?"

"মাগো—নজর জবর, নজর জবর।"

"তা বেশ! বেশ! বেশ! তোদের কান কেমন লো ইসানুসিরা ? যে সব কথা মুখে মুখে হয় না, সে সব কথা শুনতে পাস তো ?"

"মাগো কান আমাদের সদাই খাড়া।"

"তা বেশ! বেশ! বেশ! আমার চেলীর দল, দেবতার বিচার করবি তো ঠিক ?"

"মাগো, করবো ঠিক।"

"তবে যা, শকুনীর পাল আর দেরী করিসনে।" তারপর জল্লাদদের দেখিয়ে সে বললো, "দেখছিসনে জল্লাদেরা বর্শা শানাচ্ছে, দেখছিসনে সাদামানুষের দল দেখার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। যা ওলো যা!"

একটা হিংস্র জানোয়ারের মত বিকট উল্লাসে গাগুলের সহচরীরা চতুর্দিকে বেরিয়ে গেলো। আমাদের সবচেয়ে নিকটে যেটা ছিল তার ওপর আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ করলাম। যোদ্ধাদের নিকটে এসে সে থেমে গেলো ; তারপর উদ্দাম নৃত্যের সঙ্গে কর্কশ কণ্ঠে আবোল তাবোল এই বলে চেঁচাতে লাগলো, "বদমাসের গন্ধ নাকে আসছে, বিষ দেনেওয়ালাকে ধরে ফেলেছি। রাজার অনিষ্ট করার খবর সব পাচ্ছি —পাচ্ছি।"

ক্রমশই দ্রুত থেকে দ্রুততর লয়ে সে নাচতে লাগলো। নাচতে নাচতে উত্তেজনায় এমন হয়ে উঠলো যে তার কষ বেয়ে ফেনার টুক্রো ছিট্‌কে ছিট্‌কে পড়তে লাগলো। নাচতে নাচতে হঠাৎ একসময় সে মড়ার মতন কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো; তারপর তার যাদুদণ্ড ধরে অতি সন্তর্পনে গুঁড়ি মেরে সামনের সৈন্যদের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলো। তার ঐভাবে আসা দেখে সৈন্যরা ভয়ে কুঁকড়ে উঠতে লাগলো। কুকুরের মতন ধীরে ধীরে এগিয়ে আসতে আসতে সে একবার করে থামতে লাগলো আর তাদের দিকে এগোতে লাগলো। তারপর হঠাৎ চীৎকার দিয়ে লাফিয়ে উঠে সে তার কাঁটার মতন কাঠি দিয়ে একজন লম্বা সৈনিককে স্পর্শ করলো। সঙ্গে সঙ্গে পাশের দু'জন সঙ্গী সৈনিক, হতভাগ্যকে দুপাশ থেকে ধরে টান্‌তে টান্‌তে রাজার দিকে নিয়ে চললো।

লোকটা একটু বাধাও পর্যন্ত দিলো না। আমাদের বোধ হলো পক্ষাঘাতগ্রস্ত লোকের মতন সে পা দুটো হিঁচড়ে টেনে নিয়ে চলেছে। মাঝ পথেই দুই জন ভীষণ দর্শন জল্লাদ তাদের সামনে এগিয়ে এলো। মুখোমুখি হতেই জল্লাদরা রাজার মুখের দিকে যেন আদেশের জন্য চাইলো।

রাজ-আদেশ হলো, "খতম্ করো"

গাগুল কেঁউ কেঁউ করে উঠলো, "খতম্ করো"

চাপা হাসিতে সে আদেশ স্কাগ্‌গার কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠলো, "খতম্ করো!"

হুকুম হতে না হতেই একজন সৈনিকটির বুকে বর্শা বসিয়ে দিলো আর একজন একটা মস্ত মুষল দিয়ে তার মাথাটা চুরমার করে গুঁড়িয়ে দিলো।

মহারাজ তওয়ালা ঘোষণা করলো "এ—ক !"

প্রথমটি শেষ হতে না হতেই আর একজনকে টেনে বলির ষাঁড়ের মতন আনা হলো। তার গায়ে চিতাবাঘের ছাল জড়ানো দেখে বুঝতে পারলাম লোকটি বেশ উচ্চপদস্থ। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে লোকটার দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়লো।

রাজা গুনলো, "দু-ই !"

এমনি ভাবে ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড চলতে লাগলো। আমাদের পিছনে একটার পর একটা করে প্রায় একশোটা মৃত দেহ টান করে করে সাজিয়ে রাখা হলো।

রাত যখন সাড়ে দশটা তখন খানিক বিরাম দেখা গেলো। মনে হলো ডা'ন সন্ধানীর দল তাদের নৃশংস কাজে যেন ক্লান্ত বোধ করেই ক্ষান্ত দিলো। আমরাও ভাবলাম যে খেলা বুঝি এইবার শেষ হলো। কিন্তু তা হলো না। কারণ পরক্ষণেই দেখতে পেলাম যে, সেই খুন্‌খুনে বুড়ী, গাগুল, তার জবুথবু আসন ছেড়ে লাঠি ভর দিয়ে টলতে টলতে মাঝখানের খোলা জায়গাটায় এসে দাঁড়ালো। তারপর বিড় বিড় করতে করতে একবার এদিকে, একবার ওদিকে ছুটে ছুটে বেড়াতে লাগলো। এমনি করতে করতে সে হঠাৎ সৈন্যদের সামনে দাঁড়ানো একজন লম্বা লোকের দিকে ধেয়ে গিয়ে তাকে স্পর্শ করলো। সঙ্গে সঙ্গে তার অধীনস্থ বাহিনীর মধ্য থেকে একটা গুম্‌রানিভাব গুম্‌রে উঠলো। কিন্তু সেই আগের মতনই তাকেও দুইজন সৈনিক হত্যাকারীদের দিকে ধরে নিয়ে গেলো।

তওয়ালা সংখ্যা ঘোষণা করলো, "একশো তি—ন।"

তারপর গাগুল আবার লাফিয়ে উঠলো। এবারে নাচতে নাচতে সে ক্রমশই আমাদের দিকে ধেয়ে আসতে লাগলো।

গুড্ ভয়ে চাপা গলায় বলে উঠলো, "সব্বোনাশ! বুড়ী আমাদের ওপর ভেল্কী দেখাবে নাকি?"

"কি আবোল তাবোল বকছো!" স্যার হেনরী বললেন।

আমার কথা বলবো কি, সেই ডাইনী বুড়ীটাকে অমনি ভাবে এগিয়ে আসতে দেখে আমার প্রায় ধাত ছাড়ার মতন অবস্থা হলো।

গাগুলের সেই বীভৎস নাচ ক্রমেই আমাদের নিকটবর্তী হতে লাগলো। তার ভয়ঙ্কর চোখ দুটো একটা কুৎসিত কামনায় জ্বল জ্বল করে জ্বলতে লাগলো। অবশেষে সে আমাদের সামনে এসে স্থির হয়ে দাঁড়লো।

স্যার হেনরী নিজের মনে বলে উঠলেন, "কে-কে?" মুহূর্তের মধ্যে সকল সন্দেহ ভঞ্জন করে সেই ডাইনী বুড়ী ছুটে গিয়ে উমবোপার কাঁধ স্পর্শ করলো।

পাখীর মতন তীব্র কর্কশ কণ্ঠে চেঁচিয়ে বলে উঠলো, "শুঁকে বের করেছি; মার, ওকে মার, ভালো চাস তো রাজা ওকে মার! ওর জন্যে রক্ত বয়ে যাবে, ওরে ওকে মার—একেবারে মেরে ফ্যাল!"

মুহূর্তের জন্য স্তব্ধতা দেখা গেলো। সেই অবসরেই আমি দাঁড়িয়ে উঠে জোর গলায় বললাম, "সে কি রাজা! এই ব্যক্তি তোমার অতিথিদের ভৃত্য। পবিত্র আতিথ্যের মর্যাদানুসারে এই ব্যক্তির জীবন রক্ষার দাবী করি আমরা!"

"গাগুল যখন গন্ধ পেয়েছে, ওকে তখন মরতেই হবে সাদা-মানুষের দল।", গম্ভীর ভাবে জবাব এলো।

"না, তা হতে পারে না," প্রত্যুত্তরে আমি বললাম' "যে ওর গায়ে হাত দেবে তাকেই উল্টে মরতে হবে।"

"পাক্‌ড়ো!" জল্লাদদের ওপর তওয়ালা গর্জে উঠলো।

আমাদের দিকে কয়েক পা এগিয়েই তারা ইতস্ততঃ করতে লাগলো। কারণ ইগ্‌নোসি ইতোমধ্যে এইভাবে জীবন বলি দেবার আগে বর্শা তুলে তৈরী হয়ে ছিল।

আমি হেঁকে উঠলাম, "খবরদার কুত্তারদল। ওর মাথার একটা চুল ছুঁয়েছিস কি তোদের রাজার জান নিয়েছি।" বলে আমি তওয়ালার দিকে রিভলবার উঁচিয়ে ধরলাম। স্যার হেনরী সামনের দিকের জল্লাদকে লক্ষ্য করলেন আর গুড্ গাগুলকে সাবাড় করবার স্থির লক্ষ্য নিয়ে হাতিয়ার তুললো।

আমার রিভলবারের নল তওয়ালার বিস্তৃত বুকের সঙ্গে সমান এক রেখায় রয়েছে বুঝতে পেরে সে চঞ্চল হয়ে উঠলো। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "এবার বলো তওয়ালা কি তোমার ইচ্ছে?"

"তোমাদের মন্ত্রপুত নলগুলো সরিয়ে নাও" সে উত্তর দিলো, আতিথেয়তার নামে তোমরা আমাকে টলিয়েছো এবং মনে রেখো সেই জন্যেই ওকে ছেড়ে দিলুম—ভয়ে কিন্তু নয়। এখন শান্তিতে যেতে পারো।"

যেন কিছুই হয়নি, এমনি ভাবে আমি বললাম, "উত্তম কথা, এই হত্যা দেখতে আমাদের আর ভালো লাগছে না, ঘুমোতে চাই। নাচ শেষ হয়েছে কি?"

খুব চটা মেজাজেই সে জবাব দিলো, "হয়েছে।" তারপর সারি সারি মৃতদেহ গুলোর দিকে দেখিয়ে বলে উঠলো, "হায়না আর শকুনি-দের এই কুত্তাগুলোকে খেতে দিগে যা।" এই কথা বলে সে তার বর্শা ওঠালো। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত সৈন্যের দল প্রাঙ্গণের বাইরে যাবার জন্য ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলো।

মহারাজকে সেলাম জানিয়ে আমরাও কুটীরে ফিরলাম।

চন্দ্রলোক বাসীর ক্ষমতা

কুটীরে ফিরে এসে পাইপ ধরিয়ে আমরা অনেকক্ষণ কাটালাম। তারপর যখন শুতে যাবো মনে করছি, তখন কুটীরের বাইরে অনেকগুলি পায়ের শব্দ পেলাম। আমাদের কুটীর প্রহরী তাদের পথ আটকালো। যথাযথ প্রত্যুত্তর পাওয়ার পর মুহূর্তেই ইন্‌ফাডুস্ প্রায় জনা-ছয়েক ভীম-দর্শন সর্দারকে সঙ্গে করে আমাদের কুটীরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলো।

"প্রভু, আমার কথামত আমি এসেছি।" সে বললো, "আর সঙ্গে করে এনেছি আমাদের এই সর্দারদের। এঁরা প্রত্যেকেই আমাদের মধ্যে উচ্চপদস্থ এবং প্রত্যেকেই প্রায় তিন হাজার সৈন্যের অধীশ্বর। ইগ্‌নোসি, এঁদেরকে আমি তোমার বিষয় যা শুনেছি বা দেখেছি সব বলেছি। এখন এঁরা নিজেরা দেখে শুনে সন্দেহ দূর করে ঠিক করতে চান যে, রাজা তওয়ালার বিরুদ্ধে তোমার সঙ্গে যোগ দেবেন কিনা?"

এর উত্তরে ইগ্‌নোসি, তার কটিবাস মোচন করে সবাইকে সেই পবিত্র সর্পচিহ্ন আবার দেখালো এবং সবিস্তারে তাদের কাছে আবার তার কাহিনী বললো।

ইন্‌ফাডুস্ তারপর সর্দারদের উদ্দেশ্য করে বললো, "সর্দার প্রধানেরা, আপনারা সবই শুনলেন এখন বলুন, আপনারা একে সাহায্য ক'রে

একে এর পিতৃসিংহাসনে বসাবেন, কি বসাবেন না ? দেশ তওয়ালাকে চায় না। তার অত্যাচারে রক্তের নদী বয়ে যাচ্ছে। ভাইসব তাহলে বিবেচনা করুন আমাদের কি কর্ত্তব্য।"

সর্দারদের মধ্যে যে বয়স্ক ব্যক্তিটি এগিয়ে এলো, দেখতে সে বেঁটে, পাকা-পোক্ত গড়ন আর মনে হলো একজন ঝানু যোদ্ধা। মাথা ভরা তার সাদা চুল—সেই জবাব দিলো,—

"ঠিকই বলেছো ইন্‌ফাডুস্‌, তওয়ালার অত্যাচারে দেশ অতিষ্ট হয়ে উঠেছে। আজকের রাতে আমার এক ভাইও মরেছে। কিন্তু এ যে ভয়ানক সমস্যা! আমরা কেমন করে বুঝবো, যে যার জন্যে আমরা অস্ত্র ধরবো সে প্রবঞ্চক কিনা ? এ নিশ্চিত যে, এর জন্যে প্রচণ্ড লড়াই আমাদের লড়তে হবে। কারণ আমরা এর দলে যোগ দিলেও অপর পক্ষেও অনেকেই রয়ে যাবে। তা ছাড়া জানো তো উদিত সূর্যকেই সকলে পূজা করে, অনুদিতকে নয়।"

"কেন পবিত্র সর্পচিহ্ন তো রয়েছে।" আমি বললাম।

"প্রভু," লোকটি উত্তর করলো, "সর্পচিহ্ন তো ওর জন্মাবার পরও অঙ্কিত হয়ে থাকতে পারে। ও যখন তারার দেশের মহাপ্রভুদের আশ্রয়ে আছে, তখন এমন কোন নিদর্শন দিন, যাতে সকলেই বুঝতে পারে যে, ও-ই সত্যিকারের রাজা।"

অন্য সর্দারেরাও এই কথাতে ঘাড় নাড়লো। আমরা ভীষণ মুস্কিলে পড়ে গেলাম!

গুড্ খুব উৎফুল্ল হয়ে বলে উঠলো, "আমি সে নিদর্শন দেবো, ওদের একটু সময় দিতে বলুন।"

ওদের সে কথা বুঝিয়ে বলাতে ওরা বাইরে গিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো। গুড্ তার ডাইরী খুলে, একটা বিজ্ঞাপনের পাতার

পিছনে দেওয়া পঞ্জিকার তিথি হাতড়াতে হাতড়াতে বললো, "কাল ৪ঠা জুন, না ?"

আমরা দিনের হিসাব খুব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে রাখতাম, তাই ঠিক ঠিক বলতে পারলাম।

সে বলে উঠলো, "এই দেখুন, ৪ঠা জুন, গ্রীন উইচ ৮.১৫ মিনিট পূর্ণগ্রাস চন্দ্র গ্রহণ। দক্ষিন আফ্রিকা ও অন্যান্য স্থানে দ্রষ্টব্য। ওদের বলুন আমাদের এই নিদর্শন যে—কাল রাতে আমরা চাঁদকে কালো করে দেবো।"

পরিকল্পনাটা খুবই চমৎকার হলো বটে, কিন্তু আমার কেমন সন্দেহ হতে লাগলো। তবু রাজী হলাম। উম্‌বোপা সর্দারদের আবার ডেকে নিয়ে এলো।

ঘরের দরজার কাছে গিয়ে আমি বললাম, "ইন্‌ফাদুস্—কুকুয়ানা সর্দার প্রধানেরা আসুন—আপনারা সবাই এখানে আসুন।" তারা সবাই এলে আমি অস্তগামী লাল চাঁদকে দেখিয়ে বললাম, "ওটা কি দেখছেন ?"

"অস্তমিত চাঁদ" তাদের মুখপাত্র বলে উঠলো।

"বেশ। আচ্ছা বলুন দেখি, চাঁদ অস্ত যাবার নির্দিষ্ট সময়ের আগে কোন মানুষ তাকে নিভিয়ে দিয়ে পৃথিবীতে অমানিশার অন্ধকার বিছিয়ে দিতে পারে ?"

সর্দারটি একটু হেসে বললো, "প্রভু, তা কোন মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়।"

"ঠিক কথা। আচ্ছা, কাল মধ্যরাত্রির দু'ঘণ্টা আগে আমরা চাঁদকে দেড়ঘণ্টার মতন ধ্বংস করার ব্যবস্থা করবো। সমস্ত পৃথিবী ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে যাবে। ইগ্‌নোসিই যে

কুকুয়ানাদের রাজা, তা প্রমাণ করে দেবে এই ঘটনাই। কেমন ঠিক আছে ?”

"হ্যাঁ প্রভু," সেই বৃদ্ধ সর্দারটি বললো, “তা হলে আমরা সত্যিই নিশ্চিন্ত হবো।”

“হ্যাঁ তাই হবে, বুঝলে ইন্‌ফাডুস্ ?” আমি বললাম।

তারা সবাই খুসী হয়ে একথা মেনে নিলো। ইন্‌ফাডুস্ জানালো যে 'লু'থেকে দু'মাইল দূরে প্রতিপদের চাঁদের মতন বাঁকা একটি পাহাড় আছে, সেখানে এক সুরক্ষিত জায়গায় তার আর এই সর্দারদের তিনটি বাহিনী হাজির রাখা হয়েছে। আমরা যদি কাল রাতে মেয়েদের নাচের সময় পৃথিবী অন্ধকার করতে পারি, তবে সেই ফাঁকে গা-ঢাকা দিয়ে আমাদের নিয়ে সে 'লু' ছেড়ে পালিয়ে গিয়ে সেখানে উঠবে। তারপর সেখান থেকেই রাজা তওয়ালার বিরুদ্ধে লড়াই চালাবে।

তাই স্থির করে আমরা ঘুমোতে গেলাম। পরদিন যখন ঘুম ভাঙলো তখন প্রায় বেলা এগারোটা। সারাদিন কুকুয়ানাদের দেশে তাদের রীতিনীতি দেখে বেড়ালাম। অবশেষে সন্ধ্যা হলো। রাত্রি সাড়ে আটটায়, রাজদূত এসে খবর দিলো যে, বাৎসরিক 'কুমারী নৃত্য' দেখবার জন্য রাজা আদেশ জানিয়েছেন।

আমরা তাড়াতাড়ি রাজার দেওয়া সেই লোহার বর্মগুলি জামার তলায় পরে নিলাম। ইন্‌ফাডুসের কথামত যদি পালাতেই হয়, এই ভেবে রাইফেল ও গোলাগুলি সব সঙ্গে করে সাহসে বুক বেঁধেই বেরুলাম তবু বুকের মধ্যে ঢিপ্ ঢিপ্ করতে লাগলো।

রাজার কুটীরের সামনে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণটি গত রাতের চেয়ে অন্য রকম লাগতে লাগলো। আজ সেখানে কোন অস্ত্রধারী ভীষণ দর্শন

সৈন্যের দল ছিল না। তার বদলে সেখানে দেখতে পেলাম দলের পর দল কুকুয়ানা কুমারীরা মাথায় ফুলের মালা পরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এক হাতে তাদের কচুর সাদা ফুল আর এক হাতে তাল পাতা। চন্দ্রালোকিত মধ্য-প্রাঙ্গণে বসে আছে রাজা তওয়ালা, তার পায়ের কাছে বুড়ী গাগুল; পাশে রয়েছে ইন্‌ফাদুস্‌ যুবরাজ স্ক্রাগ্‌গা এবং বারো জন প্রহরী। এছাড়া আরো জনকুড়ি সর্দারও সেখানে হাজির দেখলাম।

তওয়ালা প্রকাশ্য আন্তরিকতা দেখিয়েই আমাদের স্বাগত জানালে, তবে আমি বেশ বুঝতে পারলাম যে উম্‌বোপার ওপর সে অগ্নিদৃষ্টি হানছে।

সে বলে উঠলো, "এসো তারার দেশের সাদামানুষেরা; কাল চাঁদের আলোয় যা দেখেছিলে আজকে তার চে' অন্য কিছু দেখতে পাবে। তবে আজকের জিনিস দেখে তোমরা তেমন আনন্দ পাবে না। আর কালা-মানুষ, তোকেও স্বাগত জানাচ্ছি; কাল গাগুলের কথা ফলে গেলে এতক্ষণ তোর লাস জমে শক্ত বরফ হয়ে যেতো। তোর ভাগ্য ভালো তুই তারার দেশ থেকে এসেছিস; হাঃ! হাঃ! হাঃ!"

ইগ্‌নোসি ধীরভাবে উত্তর দিলো, "মরার আগে তোমাকেও শেষ করে যেতাম।"

এই কথায় তওয়ালা চমকে উঠলো, "খুব যে সাহস দেখছি ব্যাটা!" সে রেগে বলে উঠলো, "বেশী বাড়্‌ফাট্টাই করিস নে!"

"যে সত্য বলে, সে কাউকে ডরায় না।"

তওয়ালা বিকট ভ্রুভঙ্গী করে উঠলো কিন্তু মুখে কিছু বললো না। শুধু নাচ সুরু করতে হুকুম দিলো।

ফুলের মালা মাথায়-পরা মেয়েরা দলে দলে সাদা ফুল আর পাতা নেড়ে নেড়ে গান করতে লাগলো। নৃত্যপরা মেয়েদের উঠতি চাঁদের হাল্কা আলোয় পরীর মতন অদ্ভুত লাগতে লাগলো। ঘুরে ঘুরে কত রকমের নাচ তারা নাচলো। অবশেষে তাদের সমবেত নৃত্য শেষ হয়ে গেলো। তারপর তাদের দল থেকে একটি খুব সুশ্রী মেয়ে সামনে এগিয়ে এসে একলা নাচতে লাগলো। তার সুন্দর নাচে আমরা মুগ্ধ হয়ে গেলাম। সে ক্লান্ত হয়ে বসে পড়লে পর তার জায়গায় আর একজন নাচতে এলো। এমনি করে একের পর এক বাছাই করা মেয়েরা সব নেচে গেলো। কিন্তু প্রথমজনার নাচের মতন অমন সুন্দর ভঙ্গীমা, নৃত্য কুশলতা আর কারুর দেখলাম না।

সবায়ের নাচ হয়ে যাবার পর রাজা হাত উঠিয়ে জিজ্ঞাসা করলো, "সাদামানুষেরা, এদের মধ্যে সবচে' কে ভালো দেখতে ?"

কোন কিছু চিন্তা না করেই আমি উত্তর দিলাম, "কেন, প্রথম মেয়েটি।"

"তাহলে ঠিক হয়েছে তোমার চোখ আমার চোখ—এক। ওই সবচেয়ে সুন্দরী। কিন্তু সেই জন্যেই ওকে মরতে হবে।"

"হুঁ, তাই—মরতে হবে!" গাগুল কেঁউ কেঁউ করে উঠে তার কুটিল চঞ্চল দৃষ্টি দিয়ে মেয়েটির দিকে তাকালো।

অন্তরের সমস্ত ঘৃণা চেপে কোন রকমে আমি জবাব দিলাম, "তা কেন রাজা ? মেয়েটি দেখতেও সুন্দরী, নেচেছেও ভালো, আমরা খুসীও হয়েছি কিন্তু এই জন্য কি ওর প্রাপ্য মৃত্যু-পুরস্কার ?"

তওয়ালা হাসতে হাসতে উত্তর দিলো, "এই আমাদের নিয়ম।" তারপর দূরে তিনটি পাহাড়ের চূড়ার দিকে দেখিয়ে বললো, "ঐ—ওখানে যে দেবতারা আছেন এই বলি তাঁদের প্রাপ্য। আজকে যদি তাঁদের

আমি এ বলি না দেই, তবে আমার ওপর অভিশাপ লাগবে। শোনো সাদা-মানুষেরা, এর আগে আমার যে ভাই রাজত্ব করতো সে মেয়েদের কান্নায় বিচলিত হয়ে এই বলি বন্ধ করেছিল ; কিন্তু ফলে হয়েছিল তার পতন। তাই আজ তারই বদলে আমি এখানে রাজত্ব করছি। যাক্ আর কথা নয় ওকে মরতেই হবে!"

তারপর প্রহরীদের দিকে তাকিয়ে বললো, "ওকে নিয়ে আয়। স্কাগ্‌গা বর্শা ঠিক রাখো।"

প্রহরীদের দু'জন এগিয়ে গেলো। তাদের অগ্রসর হওয়া দেখে মেয়েটি তার আসন্ন বিপদ উপলব্ধি করতে পারলো। সে ভয়ে চীৎকার দিয়ে পালাবার পথ খুঁজতে লাগলো। কিন্তু শক্ত দু'খানা হাতে তাকে টেনে আমাদের সামনে নিয়ে এলো। মেয়েটি আছাড়ি-পিছাড়ি করে কাঁদতে লাগলো।

"তোর নাম কিরে বেটী।" গাগুল খ্যান্ খ্যান্ করে উঠলো, "কি! জবাব দিবিনে ? যুবরাজ এখুনি তোকে শেষ করবে না কি ?"

মেয়েটি কাঁপতে কাঁপতে উত্তর দিলো, "মাগো আমার নাম, ফৌলতা, 'সুকো' বাড়ীর মেয়ে। তোর পায়ে পড়ি মা, আমি তো কোন অপরাধ করিনি, তবে কেন মরবো ?"

"যুবরাজ নিজের হাতে তোকে মারবে, তবে আর কান্না কিসের ?" বুড়ী তার সেই ঘৃণ্য ব্যঙ্গ-ভরা কণ্ঠে বলে যেতে লাগলো।

ফৌলতা হাত দুখানি মোচড়াতে মোচড়াতে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো, "ওগো নিষ্ঠুর! তোমাদের কি একটু দয়া হবে না ? আমার এই তো বয়েস, কেন আমি মরবো ? কি করেছি আমি যে রাত্রি প্রভাতে সুন্দর সূর্যোদয় আর দেখতে পাবো না ? কি করেছি আমি যে, সন্ধ্যারাতে তারাভরা আকাশের দিকে চোখ তুলে আর চাইতে পারবো না ? কি

করেছি আমি যে, শিশির ভেজা সকালে আর ফুল তুলতে পারবো না, ঝরণার হাসি আর শুনতে পারবো না ?”

গাগুল বা গাগুলের প্রভুর মন এতে একটুও টলেছে বলে মনে হলো না। প্রহরী আর উপস্থিত সর্দারদের মুখে আমি কিন্তু সহানুভূতির চিহ্ন দেখতে পেলাম।

মনের সমস্ত ব্যথা নিংড়ে নিংড়ে মেয়েটা কেঁদে উঠতে লাগলো ; তারপর হঠাৎ এক সময়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে গুডের সুন্দর সাদা পা দু'টো জড়িয়ে বলতে লাগলো, “ওগো তারার দেশের দেবতা ! তুমি আমাকে বাঁচাও—এদের হাত থেকে বাঁচাও !”

গুড্ বিচলিত হয়ে ইংরেজীতেই বলে উঠলো, “তাই হবে সোনামণি, তাই হবে, তোকে আমি বাঁচাবো ! লক্ষ্মী মেয়ে ওঠ্-ওঠ্।” বলে তার হাত ধরলো।

তওয়ালার ইঙ্গিতে স্কাগ্‌গা উদ্যত বর্শা নিয়ে এগিয়ে এলো।

আমি চাঁদের দিকে একটা হতাশ দৃষ্টি হেনে পূর্ণ গাম্ভীর্য নিয়ে স্কাগ্‌গার উদ্যত বর্শা ও মেয়েটির মাঝে এগিয়ে গেলাম।

“রাজা”, আমি বললাম, “আমাদের সামনে এ হতে দেবো না। তুমি মেয়েটিকে নিরাপদে যেতে দাও।”

যুগপৎ বিস্ময় ও ক্রোধে তওয়ালা আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। উপস্থিত সর্দার ও মেয়েদের মধ্য থেকে একটা বিস্ময়ের ধ্বনি বেরিয়ে এলো।

“হ'তে দেবোনা ! সাদা কুত্তা, সিংহের গুহায় ঢুকে তাকে ঘেউ ঘেউ করে ভয় দেখাতে চাস ? উন্মাদ কোথাকার ! হ'তে দেবোনা ? আমার কাজে বাধা দেবার তোদের কি অধিকার ? ফের আমি বলছি, স্কাগ্‌গা, হত্যা কর্ ! কে আছিস্ বাঁধ এদের।”

রাজার চীৎকারে কুটীরের পিছন থেকে সশস্ত্র প্রহরীরদল ছুটে এলো। স্পষ্ট বোঝা গেলো যে, তাদের আগে থেকেই সেখানে রাখা হয়েছিল।

স্যার হেনরী, গুড্ আর উম্বোপা আমার পাশে এসে রাইফেল তুলে দাঁড়ালো।

যদিও আমাতে আর আমি ছিলাম না, তবুও সাহসভরে বলে উঠলাম, "দাঁড়া! দাঁড়া! আমরা তারার দেশের লোকেরা বল্ছি, এ নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড চলবে না। এক পা এগিয়েছিস্ কি চাঁদকে নিভিয়ে দিয়ে আমরা সমস্ত দেশকে অন্ধকারে ডুবিয়ে দেবো। তখন বুঝতে পারবি আমাদের যাদুর শক্তি!"

"শোন্! ওরে শোন্!" গাগুলের গলা শোনা গেলো, "ওরে মিথ্যেবাদীদের কথা শোন্; বাতির মতই এরা চাঁদ নিবিয়ে দেবে! হ্যাঁ, ওরা যদি চাঁদকে নেবাতে পারে তবে কন্যে মুক্তি পাবে।"

আমি হতাশ হয়ে চাঁদের দিকে তাকালাম। এবারে আশার সঞ্চার হলো। যাক্ পাঁজীর গণনা ভুল নয় তাহলে! গোল চাঁদের কিনারে একটুখানি ছায়া পড়েছে আর একটা ধোঁয়ার মত রঙ তার ঔজ্জ্বল্যকে ক্রমেই ম্লান করে আনছে।

আমরা সকলে আকাশে হাত তুলে মন্ত্র পড়ার মতন করতে লাগলাম।

ধীরে ধীরে একটা আব্ছা ছায়া চাঁদের থালার ওপর গড়িয়ে গড়িয়ে আসতে লাগলো। যতই তা জমাট বাঁধতে লাগলো ততই সমবেত জনতার মধ্য থেকে একটা ভয়ের রুদ্ধ নিঃশ্বাস বেরিয়ে আসতে লাগলো।

আমি বলতে লাগলাম, "দেখো রাজা—দেখো, গাগুল দেখো, সর্দার-মণ্ডলী দেখুন, উপস্থিত নর-নারীরা তোমরা সকলেও দেখো, তারার দেশের লোকেরা মিথ্যে বলে কি সত্য বলে!

"চাঁদ কালি হয়ে যাচ্ছে—এখুনি সমস্ত পৃথিবী আঁধারে ডুবে যাবে—পূর্ণিমার রাতে অমাবস্যা দেখা দেবে। তোমরা নিদর্শন চেয়েছিলে, এই নাও সেই নিদর্শন।"

সমস্ত দর্শকদের মধ্য থেকে ভয়ের একটা চাপা আর্তনাদ উঠলো। ভয়ে কেউ মুহ্যমান হয়ে পড়লো, কেউবা বসে কাঁদতে সুরু করে দিলো। রাজা তার আসনে বসে ভয়ে বিবর্ণ হয়ে উঠলো। কেবল মাত্র গাগুল তখনও সাহস ভরেই চেঁচাতে লাগলো, "ওরে এ কেটে যাবে, এরকম আমি দেখেছি আগে। ভয় পাসনে রে—ভয় পাসনে! চুপ করে বোস্—ছায়া মিলিয়ে যাবে।"

উত্তেজনায় আমি লাফিয়ে উঠলাম, বলতে লাগলাম "বেশ অপেক্ষা করো, তাহলেই মজা টের পাবে।"

গোল কালো ছায়া চাঁদের ওপর আরো ঘন হয়ে উঠলো। সমস্ত জনতা রুদ্ধ নিঃশ্বাসে নির্বাক মৃত্যুর মতন আকাশের দিকে চেয়ে রইলো। চারদিকের সেই প্রশান্ত নিস্তব্ধতার মধ্যে মুহূর্তগুলি একের পর এক অতিক্রান্ত হতে লাগলো। আর সেই অতিক্রান্ত প্রতিটি মুহূর্তে, পূর্ণ-চন্দ্র, পৃথিবীর গভীর থেকে গভীরতর ছায়ায় ডুবে যেতে লাগলো। চাঁদের বর্ণ তামার মতন বিবর্ণ হয়ে উঠলো। নিকষ কালির কলঙ্ক কালিমা অবিশ্রান্ত তার ওপর গড়িয়ে পড়তে লাগলো। বাতাস ভারী হয়ে উঠলো। আলো-আঁধারে কুকুয়ানাদের বীভৎস মুখগুলো ছায়ার মতন আমাদের চোখে অস্পষ্ট লাগতে লাগলো।

সেই নিঃসীম নীরবতা ভঙ্গ করে স্কাগ্‌গা অবশেষে চেঁচিয়ে উঠলো "গেলো—চাঁদ মরে গেলো! সাদা পিশাচেরা চাঁদকে মেরে ফেললো। সবাই আমরা এবারে আঁধারেই মরবো।" ভয় কিম্বা রাগে বা হয়তো দুটোতেই উত্তেজিত হয়ে, সে স্যার হেনরীকে লক্ষ্য করে সজোরে বর্শা ছুঁড়ে মারলো। বর্শাটা সোজা এসে স্যার হেনরীর বুকে লাগলো। রাজার দেওয়া লোহার জামাটা এইবার কাজে লাগলো। বর্শাটা তাতে লেগে প্রতিহত হয়ে ফিরে এলো। পুনরাক্রমণ করার আগেই স্যার হেনরী তার হাত থেকে বর্শাটা ছিনিয়ে নিয়ে সোজা তার বুকটা এ ফোঁড় ও ফোঁড় করে দিলেন। স্কাগ্‌গা আর্তনাদ করে মাটিতে পড়ে গেলো।

এই দৃশ্য ও ঘনায়মান আঁধারের ভয়ে মেয়ের দল দিশেহারা হয়ে দিক্ বিদিকে ছুটে পালাতে লাগলো। সেই দারুণ ভয় শুধু তাদের মধ্যেই ছড়িয়ে পড়লো না—রাজা, তার প্রহরীরা ও কয়েকজন সর্দারও তাদের কুটীরমুখো দৌড় দিলো। গাগুলও অদ্ভূত দ্রুততার সঙ্গে নেংচাতে নেংচাতে তাদের অনুসরণ করলো। কয়েক মুহূর্ত পরে দেখতে পেলাম, সেখানে আমরা কয়েকজন, ফৌলতা, ইন্‌ফাডুস্, গত রাতের সাক্ষাৎকারী কয়েকজন সর্দার ও স্কাগ্‌গার মৃতদেহ ছাড়া আর কেউ নেই।

একটি মুহূর্তও আর আমরা নষ্ট করলাম না। ইন্‌ফাডুসের পিছনে হাত ধরাধরি করে পূর্ব নির্দিষ্ট সুরক্ষিত স্থানের দিকে হোঁচট খেতে খেতে অন্ধকারে রওনা হলাম।

সেই প্রাঙ্গণের বাইরে যেতে না যেতেই চাঁদ সম্পূর্ণভাবে ঢাকা পড়ে গেলো। আর সেই কালিঢালা আকাশ ছেয়ে তারার দল ঝক্‌মক্ করে উঠলো।

যুদ্ধের আগে

সৌভাগ্য বশত ইন্‌ফাতুস্‌ ও সর্দারদের পথঘাট বেশ ভালো ভাবেই জানা ছিল, কাজেই অন্ধকার হলেও আমাদের পথ চলতে বেশী বেগ পেতে হলো না।

ঘণ্টাখানেক চলার পর বুঝতে পারলাম গ্রহণ ছেড়ে যাচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই চাঁদের রুপালী রেখা তার গ্রহণমুক্ত অংশ থেকে ছড়িয়ে পড়লো। তারারা ক্রমশই মিলিয়ে যেতে লাগলো। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই আমাদের অস্তিত্ব প্রকাশ হবার মতন চাঁদনীও উঠে পড়লো। তখন আমরা বুঝতে পারলাম যে 'লু' থেকে আমরা অনেক দূরে চলে এসেছি এবং একটা পাহাড়ের চূড়ার সমতল অংশের দিকে উঠছি। দেখলাম পাহাড়টা ঘোড়ার খুরের আকারে বিস্তৃত। বেশী উঁচু না হলেও ধারগুলো খুব খাড়াই বলেই মনে হলো। চারদিকে বড় বড় পাথর। পাহাড়ের উপরে তৃণাস্তীর্ণ মালভূমিতে শিবির করবার মতন প্রচুর জায়গা পড়ে রয়েছে। এইখানেই একটি সুরক্ষিত সামরিক ঘাঁটি চোখে পড়লো। সাধারণত এখানে সৈন্য বাহিনীর তিন হাজারের একদল এমনিতেই থাকে। কিন্তু সেই খাড়াই পথ বেয়ে ওঠবার সময় চাঁদের আলোয় দেখতে পেলাম যে ঐ রকমের অনেক বাহিনী সেখানে জড়ো হয়েছে। মালভূমির উপর পৌঁছে আমরা মাঝামাঝি জায়গায় একটা কুটীরে বিশ্রাম করতে বসলাম। সেখানে আমাদের ফেলে আসা

অন্যান্য জিনিসপত্তর ইন্‌ফাডুস্‌ আগেই আনিয়ে রেখেছে দেখে আমরা খুব খুসী হলাম। রাত্রিটা এমনি-ই কেটে গেলো। সকালে সৈন্যদের সঙ্গে কুকুয়ানাদের আসল রাজার পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য ইগ্‌নোসিকে নিয়ে যাওয়া হলো। সঙ্গে সঙ্গে আমরাও গেলাম।

একটি মস্ত খোলা জায়গায় খুব ঘেঁসাঘেঁসি করে সৈন্যরা চতুষ্কোনের তিনটি বাহু নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। সমস্ত দৃশ্যটা অদ্ভুত সুন্দর লাগতে লাগলো। আমরা চতুষ্কোনের মুক্ত বাহুর দিকে দাঁড়ালাম। অবিলম্বে প্রধান প্রধান সর্দার আর যোদ্ধারা আমাদের ঘিরে ফেললো।

এরপরই ইন্‌ফাডুস্‌ সৈন্যদের উদ্দেশ্যে বলতে আরম্ভ করলো! এক এক করে সে ইগ্‌নোসির বাবার কথা, তওয়ালার অমানুষিক অত্যাচারের কথা তারার দেশের সাদামানুষদের সাহায্যের কথা সব বললো। তারপর সকলের শেষে নিষ্ঠুর স্বেচ্ছাচারী রাজার জায়গায় তাদের ন্যায়তঃ, ধর্মতঃ রাজা, ইগ্‌নোসিকে প্রতিষ্ঠার আবেদনও জানালো।

ইন্‌ফাডুসের বক্তৃতার পর শ্রোতাদের মধ্য থেকে স্পষ্ট অনুমোদনের গুঞ্জন উঠলো এবং কয়েক মুহূর্ত পরেই একজন সর্দার তার বর্শা শূন্যে তুলে ধরলো আর সঙ্গে সঙ্গে হাজারো গলা থেকে রাজকীয় অভিবাদনের আওয়াজ উঠলো, "কুম।" অর্থাৎ সমবেত সৈন্যেরা ইগ্‌নোসিকে রাজা বলে মেনে নিয়েছে।

আধঘণ্টা পরে, সৈন্য বাহিনীর অধিনায়কদের নিয়ে আমাদের সমর পরিষদের সভা বসলো। আমাদের দলে বিশ হাজারের মতন সৈন্য ছিল। এদের মধ্যে আবার সাতটি দল ছিল দেশের সেরা বাহিনীর অন্যতম। তওয়ালার অধীনে তখনও প্রায় তিরিশ থেকে চল্লিশ হাজার সৈন্য মজুত।

ইন্‌ফাডুস্ ও অন্যান্য অধিনায়করা মত দিলো যে, কালকের আগে তওয়ালা কিছুতেই আক্রমণ করবে না। তাদের কথাই ঠিক মনে হলো। তাহলেও সেই দিনের মধ্যে যুদ্ধের ব্যবস্থা যতটা ঠিক করা সম্ভব আমরা তার সব কিছুই করলাম। পাহাড়ে ওঠবার পথগুলি সব পাথর ফেলে বন্ধ করে দেওয়া হলো। ওরই মধ্যে যতটা পারা যায়, শত্রুর সমস্ত সম্ভাব্য আগমনের পথও দুর্ভেদ্য করে তোলা হলো। স্থানে স্থানে বিরাট বিরাট পাথর স্তূপাকার করে জমায়েৎ করা হলো—সুযোগ বুঝে সেগুলো ওপর থেকে গড়িয়ে ফেলে শত্রুর শরীর গুঁড়িয়ে দেওয়া হবে। যথাযথ স্থানে সৈন্য মোতায়েন করা হলো। আমাদের পক্ষে যতটা করা সম্ভব তার কিছুই বাদ দিলাম না।

সমস্ত রাত্রিটা আমাদের এই সব ব্যবস্থা করতেই কেটে গেলো। তিন প্রহর রাত্রিতে আমরা একটু বিশ্রামের সময় পেলাম। মাঝে মাঝে নৈশ প্রহরীদের গলার আওয়াজ ছাড়া সর্বত্র একটা নিস্তব্ধতা বিরাজ করতে লাগলো।

স্যার হেনরী, ইগ্‌নোসি ও একজন সর্দারকে নিয়ে আমরা চারিদিক ঘুরে দেখবার জন্য পাহাড় থেকে নামলাম। কর্তব্যে রত প্রহরীদের সকলেই আপন আপন জায়গায় জেগে থাকতে দেখতে পেলাম। সমস্ত দেখেশুনে হাজার হাজার ঘুমন্ত সৈনিকের মধ্য দিয়ে পথ করে ফিরলাম। মনে হলো এদের মধ্য অনেকেরই এই শেষ বিশ্রাম।

মৃত্যুর কথা মনে হতেই, মানুষের সমস্ত জীবন-মরণ ব্যাপারটা আমার কাছে একটা কেমন অদ্ভুত রহস্যের মতন হয়ে উঠলো। কত অকিঞ্চিৎকর—কত নির্মম সমগ্র ব্যাপারটা। এই হাজার হাজার মানুষ যারা আজ রাত্রে সুখ-সুপ্তিতে স্বপ্ন দেখছে—কাল হয়তো এদের দেহ এতক্ষণ হিমেল পরশে কাঠের মতন কঠিন হয়ে উঠবে। এদের স্ত্রীরা

হয়তো স্বামী হারাবে, শিশুরা পিতৃহীন হবে, কতজনার নাম প্রিয়-পরিজনদের কাছ থেকে চিরতরে মুছে যাবে। কেবল ঐ চিরপুরাতন চাঁদ এমনিভাবেই স্নিগ্ধ আলো ছড়িয়ে যাবে ; নিশীথ বাতাস ও ঘাসের শীষে এমনি করেই দোলা দিয়ে যাবে। দিনের পর রাতে, বিশাল পৃথিবী ঠিক এমনি করেই বিশ্রাম নেবে, যেমন সে নিয়েছে অযুত বৎসর আগে আবার নেবে অযুত বৎসর পরে, যখন আমাদের চিহ্নমাত্র থাকবে না তার বুকে।

কিন্তু সত্যি কি মানুষ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় ? না—নিশ্চিহ্ন হয় শুধু তার পার্থিব নাম—তার নিঃশ্বাস-সুরভিত বাতাসে পাহাড়ে পাহাড়ে পাইন শীর্ষে শিহরণ জাগে, তার গীত-গাথা অনন্ত কালের বুকে প্রতি-ধ্বনিত হতে থাকে, তার সার্থক জ্ঞান-গর্ভে পুষ্ট হয়ে ওঠে উত্তর সাধকের দল। তার প্রাণ-ঝঙ্কারে হয় আর এক প্রাণের সৃষ্টি, তার হাসি কান্নায় বন্ধুর পরশ নিয়ে আসে নতুন দিনের প্রাণের মণিকোঠায় !

সত্যিই অশরীরী আত্মারা পৃথিবীতে আছে—কিন্তু তাদের পাওয়া যায় না ঐ সমাধি গহ্বরের ভৌতিক আঁধারে—অনির্বাণ প্রাণসত্ত্বা জন্মগ্রহণ করে নিঃশেষে মিলিয়ে যায় না, অনন্তকাল ধরে তারা শুধু রূপ হতে রূপান্তরিত হতে থাকে।

* * * *

সেদিনকার মত সব কাজ ঐখানেই শেষ করে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আমরা অবশিষ্ট রাতটুকু কাটিয়ে দেবার জন্য ফিরলাম।

ভোরবেলা ইন্‌ফাতুসের ডাকে আমাদের ঘুম ভেঙে গেলো। সে খবর দিলো যে, 'লু'তে ব্যাপক ভাবে তোড়জোড় আরম্ভ হয়ে গেছে। রাজার অগ্রগামী সৈন্যরা আমাদের পাহাড়ের দিকে এগিয়ে আসছে।

আমরা উঠে পড়লাম। আগে লোহার জামাটা পরে লড়ায়ে যাবার পোষাকে তৈরী হয়ে গেলাম। এই জামাটা এখন এতো কাজে লাগলো যে সে আর কি বলবো। এর জন্যে রাজার কাছে আমরা রীতিমত কৃতজ্ঞ বোধ করতে লাগলাম। স্যার হেনরীর সাজটা একটু অন্য রকমের হলো। তিনি একেবারে দেশী সৈন্যদের মতন করে সাজলেন। এ সাজে তাঁকে দেখতে সত্যই খুব সুন্দর লাগছিল। তাছাড়া তাঁর চমৎকার সুগঠিত দেহখানা যেন এতে আরো বেশী সুন্দর হয়ে উঠলো। কিছুক্ষণ বাদে ইগ্‌নোসিও ঠিক একই রকম পোষাকে সেজে হাজির হলো। তাদের দু'জনকে দেখে মনে হলো যে, এমন জুড়ি আর হয় না।

আমরা তাড়াতাড়ি কিছু গিলে নিয়ে ব্যাপার কতদূর হলো দেখবার জন্য বেরিয়ে পড়লাম। আমাদের মালভূমির ওপরেই একটা ছোট-খাটো ঢিবি মতন ছিল। সেটাকে আমরা প্রধান কার্যালয় আর দূর-দর্শন ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহার করতাম। সেখানে গিয়ে দেখি ইন্‌ফাডুস্ তার পাঁচ হাজারী 'ধূসর বাহিনী' নিয়ে অপেক্ষা করছে। কুকুয়ানাদের সমস্ত সেনাদলের মধ্যে নিঃসন্দেহে এদের দলই ছিল শ্রেষ্ঠ। এদের 'রিজার্ভ' হিসাবে আমরা এখন রেখে দিলাম। সেখান থেকে দেখতে পেলাম যে রাজার সৈন্যরা পিঁপড়ের সারের মতন 'লু'থেকে বেরিয়ে এই দিকে আসছে। আসছে তো আসছেই! তাদের যেন আর শেষ নেই। তিনটে সার, প্রতি সারিতে অন্ততপক্ষে এগারো থেকে বারো হাজারের মতন সৈন্য।

'লু' ছাড়িয়ে এসে তারা তিনটে দল বাঁধলো। একটি বাঁদিকে, একটি ডানদিকে আর শেষেরটি সোজা ধীরে ধীরে আমাদের দিকে এগুতে লাগলো।

ইন্‌ফাহুস্ বলে উঠলো, "এইরে! এরা দেখছি একসাথে আমাদের তিনদিক থেকে আক্রমণ করবে।"

খবরটা আমাদের তেমন ভালো লাগলো না। কারণ আমাদের আস্তানা, এ মাথা থেকে ওমাথা পর্যন্ত অর্দ্ধ-চন্দ্রাকারে মাইল দেড়েক লম্বা হওয়াতে আমাদের সামান্য সৈন্য এতক্ষণ সেই রকমভাবে সাজাতেই ব্যস্ত ছিলাম। এখন কোন্ দিক থেকে শত্রুপক্ষ আঘাত হানবে ঠিক করতে না পেরে বিভিন্ন বাহিনীকে, বিভিন্ন দিক আট্‌কাবার আদেশ দিতে হলো।

খড়্গে খড়্গে

কোন রকম ব্যস্ততা না দেখিয়ে তিনটি দল ধীরে ধীরে এগিয়ে আসতে লাগলো। আমাদের থেকে পাঁচশো গজ দূরে এসে মাঝের দলটি থামলো। এইখান থেকে আমাদের মালভূমির দিকে একখণ্ড সরু ফালি-জমি জিবের মতন এগিয়ে এসেছে। দলটি এইখানে দাঁড়িয়ে আমাদের ভড়্কি দিয়ে তাদের দলকে এগিয়ে যাবার সুযোগ দিতে লাগলো। এ চালটার উদ্দেশ্য, একসঙ্গে তিনদিক থেকে আক্রমণ চালানো।

"আঃ! একটা যদি মেসিন গান থাকতো!" নীচে সৈন্যের সারি দেখে গুড্ গুম্‌রাতে লাগলো, "তাহলে মাঠটা বিশ মিনিটে সাফ্ করে দিতাম।"

"তা যখন নেই, তখন আর আক্ষেপে ফল কি; "স্যার হেন্‌রী বল্‌লেন, "কোয়াটার মেইন, ঐ লম্বা মতন লোকটা—যেটাকে দলের অধিনায়ক বলে মনে হচ্ছে, ওটাকে এক হাত নাও—তোমার তাকটা দেখা যাক।"

এক্সপ্রেসটাতে আমি একটা বল ভরে নিলাম। আমাদের অবস্থিতিটা ভালো করে দেখবার জন্য, লোকটা একটা আর্দালী সঙ্গে করে দল ছেড়ে দশগজ এগিয়ে এলো। একটা পাথরের ওপর এক্সপ্রেসটা রেখে উবুড় হয়ে নিশানা নিলাম। পাকাপাকি পেয়েছি মনে করে

ঘোড়া টিপে দিলাম। ধোঁয়াটা কেটে গেলে, যা দেখলাম, মোটেই তাতে খুসী হতে পারলাম না। লোকটা অক্ষত দেহে দাঁড়িয়ে রয়েছে, আর তার পাশের চার পাঁচ হাত দূরে আর্দালীটা চীৎ হয়ে পড়ে আছে। লোকটা ভয় পেয়ে তার দলের দিকে দৌড় মারলো।

গুড্ গেয়ে উঠলো, "চমৎকার কোয়াটার মেইন। লোকটাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছো।"

নিজের অকৃতকার্যতায় নিজেই অস্থির হয়ে একটা অবিবেচকের মত কাজ করে বসলাম। তাড়াতাড়ি আর এক ব্যারেল গুলি ভরে দৌড়ানো সেনাপতির দিকে আবার বন্দুক দাগ্‌লাম। এবারে বাছাধন হাত তুলে একেবারে মুখ থুব্‌ড়ে পড়ে গেলো। সমস্ত ব্যাপারটাতে কেমন বিশ্রী জানোয়ারের মতন আনন্দ উপভোগ করলাম।

আমাদের সৈন্যেরা সাদামানুষের যাদুবিদ্যা দেখে উল্লসিত হয়ে উঠলো। সমস্ত ব্যাপারটা তারা একটা শুভ আরম্ভের সূচনা বলেই ধরে নিলো। স্যার হেনরী আর গুড্ ইতোমধ্যে দেখি রাইফেল তুলে গুলি করতে আরম্ভ করেছেন। আমিও তাঁদের সঙ্গে যোগ দিলাম। ফলে বন্দুকের বাইরে যাবার আগেই শত্রু পক্ষের জনা দু'য়েক ধরাশায়ী হয়ে পড়লো।

বন্দুক থামবার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের ডান দিক থেকে ভীষণ সোর উঠলো ; তারপর বাঁ-দিক থেকেও ঠিক ঐ আওয়াজই পেলাম। বুঝলাম অন্য দুই দলও আমাদের দুইপাশ আক্রমণ করেছে।

শব্দ শুনে আমাদের সামনের দলটা একটু ছড়িয়ে পড়ে, ধীরে ধীরে, দৌড়ে দৌড়ে এগুতে লাগলো। এগুতে এগুতে ভারী গলায় তারা গান গাইতে সুরু করে দিলো। আমাদের বন্দুক আবার চলতে লাগলো। মাঝে মাঝে ইগ্‌নোসি এসে আমাদের সাহায্য করতে

লাগলো। দলে দলে সৈন্য "তওয়ালা! তওয়ালা! চিলি! চিলি! (মার! মার!)" বলে হুঙ্কার দিতে দিতে ঝড়ের মতন এগিয়ে আসতে লাগলো। আমাদের সৈন্যেরাও গর্জে উঠলো, "ইগ্‌নোসি! ইগ্‌নোসি! চিলি! চিলি!" শত্রুরা আমাদের কাছাকাছি পৌঁছে যাওয়াতে, দু-পক্ষ থেকেই তোলা বা উড়ন্ত-কুর্কি চলতে লাগলো। দুই পক্ষের ছোঁড়া কুকির ঝল্‌কানীতে আর বীভৎস চীৎকারে যুদ্ধ ভীষণভাবে ঘনিয়ে উঠলো। সেই বিশাল যুদ্ধোন্মত্ত সৈনিকদল ইতস্তত ছুটোছুটি করতে লাগলো। হেমন্তের ঝরাপাতার মতন অবিশ্রান্ত মাটিতে লুঠিয়ে পড়তে লাগলো তারা। অল্পক্ষণের মধ্যেই শত্রু পক্ষের প্রবল চাপ আমাদের পক্ষে প্রতিরোধ করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ালো। আমাদের প্রতিরক্ষা বাহিনীর অগ্রগামী দল ধীরে ধীরে পিছু হঠতে সুরু করে দিলো। পিছুতে পিছুতে তারা দ্বিতীয় প্রতিরক্ষা ব্যূহের সঙ্গে এক হয়ে গেলো। এইখানে যুদ্ধ ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করলো। কিন্তু বিশ মিনিটের মধ্যেই আবার আমরা হঠতে আরম্ভ করলাম। এবার তৃতীয় দলকে ঐ দলের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসতে হলো।

এবারে আক্রমণকারীদের আক্রমণের তীব্রতা অনেকটা কমে এসেছিল। তাছাড়া তাদের হত ও আহতের সংখ্যাও কম ছিল না। এখন তৃতীয় বাহিনীর বর্শার বেড়া তাদের পক্ষে অতিক্রম করা অসম্ভব হয়ে উঠলো। সেই বিরাট বাহিনী একবার এগিয়ে যায় আবার পিছিয়ে আসে। লড়ায়ের এই জোয়ার ভাটার খেলা দেখে কোন পক্ষ যে জিতবে বলা অসম্ভব হয়ে উঠলো। স্যার হেনরী এতক্ষণ জলন্ত চোখে মানুষের মরিয়া হয়ে লড়াই করার ধরণ দেখছিলেন। তিনি আর থাকতে পারলেন না। লড়াই যেখানে সবচেয়ে মারাত্মক হয়ে ঘনিয়ে

উঠেছে, সেদিকে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। পরমুহূর্তে গুড্ও তাঁর অনুসরণ করলো। আমি শুধু যেখানে ছিলাম সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলাম।

স্যার হেনরীকে তাদের মাঝে দেখে সৈন্যরা চেঁচিয়ে উঠলো, "নান্‌জিয়া ইনকুবু! নান্‌জিয়া আন্‌কুন্‌গুন্‌ ক্লোভা! (আমাদের হাতী এসে গেছে) চিলি! চিলি!"

সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধের মোড় ঘুরে গেলো। জয় সম্বন্ধে আমি একরকম স্থির নিশ্চিত হয়ে পড়লাম। মারতে মারতে শত্রুদের ঠেলে নিয়ে চললো আমাদের সৈন্যরা। কিছুক্ষণের মধ্যেই শত্রুপক্ষ রণে ভঙ্গ দিলো। ইতোমধ্যে খবর এলো, বাঁদিকের আক্রমণও আমরা হঠিয়ে দিয়েছি। আমি ভাবলাম যে এখনকার মত নিশ্চিন্ত হওয়া গেলো।

কিন্তু পরমুহূর্তেই ব্যাপার দেখে আমার হাত পা পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে যাবার মতন হলো। দেখলাম যে আমাদের ডানদিক্‌কার রক্ষী-বাহিনীরা মাঠের ওপর দিয়ে আমাদের দিকে হুড়মুড় করে পিছু হটে আসছে আর তাদের পিছনে ধেয়ে আসছে কাতারে শত্রুসৈন্যের দল।

ইগ্‌নোসি আমার পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল। সে ব্যাপার দেখে আমাদের রিজার্ভ বাহিনী 'ধূসর দলকে' হুকুম দিলো। আর পর মুহূর্তেই দেখলাম যে' নিতান্ত অনিচ্ছা সত্বেও আমি এক ভীষণ সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে পড়েছি। ইগ্‌নোসির বিরাট দেহের আড়ালে থেকে আমি সেই বিশ্রী হত্যাকাণ্ডের সেরা কর্মী হয়ে উঠলাম। তারপর যেন পায়ে পায়ে মরণটানেই এগিয়ে চললাম। এরপর কি হলো আমার কিচ্ছুই মনে নেই, শুধু কানে ভেসে এলো মুখোমুখী দুই দলের ঢালের ভীষণ ঝন্‌ঝনি! হঠাৎ কোথা থেকে রক্তমাখা বর্শা হাতে একটা প্রকাণ্ড দৈত্যের মতন লোক আমার দিকে ঝাঁপিয়ে পড়লো। চোখ দুটো তার কপাল

থেকে ঠিক্‌রে বেরিয়ে আসছে মনে হলো। লোকটা আমার ওপর পড়বার আগেই আমি তার সামনে এমন ভাবে মাটিতে পড়ে গেলাম যে, লোকটা নিজেকে সামলাতে না পেরে আমার ওপরই হুড়মুড় করে পড়ে গেলো আর সঙ্গে সঙ্গে আমিও এর সুযোগ নিলাম। চট্‌পট্‌ আগেই উঠে পড়ে পিছন থেকে রিভলবারের এক গুলিতেই তার ভবলীলা ঘুচিয়ে দিলাম। হঠাৎ মাথায় ভয়ানক জোরে একটা কি এসে লাগলো—তারপর আর কিছুই মনে নেই।

যখন জ্ঞান হ'লো দেখি, গুড্ জলের বাটি হাতে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি উঠে বসলাম। গুরুতর তেমন কিছুই ঘটেনি, আচম্‌কা মাথায় চোট লাগাতে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম। যুদ্ধের খবরে জানতে পারলাম যে, সামায়িক ভাবে আমরা শত্রুদের হঠিয়ে দিয়েছি। তবে ক্ষতির পরিমান অবর্ণনীয়। আমাদের হতাহতের সংখ্যা দু'হাজার আর শত্রু পক্ষের প্রায় তিন হাজার।

টিলাটার একপাশে স্যার হেনরী দেখলাম, ইগ্‌নোসি, ইন্‌ফাদুস্ ও আরও কয়েকজন সর্দারকে নিয়ে কি এক গভীর পরামর্শ করছেন। আমি যেতেই তিনি বলে উঠলেন, এই যে, "ভগবানকে অজস্র ধন্যবাদ যে তুমি উঠতে পেরেছো। শোনো কোয়াটার মেইন, ইগ্‌নোসি যে কি চায় আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। এখনকার মতন যদিও আমরা ওদের হঠিয়ে দিয়েছি, তবে মনে হয় যে, তওয়ালা আবার নতুন সৈন্য নিয়ে আক্রমণ সুরু করবে। তাছাড়াও ওরা আমাদের এইখানেই ঘেরাও রেখে না খেতে দিয়ে মারবার মতলব আঁটছে।

"সে রকম হলে তো সংঘাতিক !"

"আজ্ঞে হ্যাঁ," ইন্‌ফাদুস্ বলে উঠলো, "ব্যাপারটা সাংঘাতিকই বটে, আমাদের জল একদম ফুরিয়ে এসেছে। খাবারও বেশী নেই। আমরা জখমও হয়েছি মারাত্মক ভাবে। তওয়ালা শুধু এখন আমাদের মরার জন্যেই অপেক্ষা করবে। সাপ যেমন করে হরিণকে বেড় দিয়ে ধরে, সে-ও অমনি ভাবেই আমাদের পাকিয়ে পাকিয়ে মারতে চায়। ও এখন লোকক্ষয় না করে বসে বসে লড়াই করবে। এ অবস্থায় আমাদের সামনে তিনটি পথ খোলা আছে। এক উপোসী সিংহের মতন নিজের গুহায় মরা। দুই, আরো উত্তরে পিছু হটে যাবার চেষ্টা করা আর নয় সোজা তওয়ালার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়া। ইনকুবুরও তাই মত। এখন মাকুমাজাহন্ আপনি কি বলেন?"

আমি স্যার হেনরী আর গুডের সাথে একটা তাড়াতাড়ি আলাদা পরামর্শ করে ফেললাম। তারপর জানালাম যে আমাদের এখুনি তওয়ালার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। তা না হলে যে রকম অবস্থা তাতে অনেকেই দল ছেড়ে তওয়ালার দলে যোগ দিতে পারে। এমন কি বিশ্বাসঘাতকতা করে আমাদের ধরিয়েও দিতে পারে। এ পরামর্শে ইগ্‌নোসি গভীর ভাবে চিন্তিত হয়ে উঠলো খানিক চিন্তা করে সে উত্তর দিলো।

"আমি মনোস্থির করে ফেলেছি। আজই তওয়ালাকে আক্রমণ করবো। আমার মতলবটা একবার শুনুন। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, পাহাড়টা অর্দ্ধ চন্দ্রের মতন বেঁকে গেছে আর নীচে ফালি জমিটা এই বাঁকের মুখে একটা সবুজ জিবের মতন আমাদের দিকে ঢুকে এসেছে।"

'ধূসর বাহিনীর' মরণ কামড়

"বুঝলাম, তারপর ?" আমরা বললাম।

"বেশ। এখন তো ঠিক দুপুর, যখন বিকেলের সূর্য আঁধারের দিকে চলবে, তখন আপনার বাহিনী আর আমার খুড়োর বাহিনী এক সঙ্গে ঐ সবুজ জিবের মতন মাঠ বেয়ে নেমে যাবে। তওয়ালা দেখা মাত্র আমাদের ধ্বংস করতে ধেয়ে আসবে। কিন্তু ঐখানে পথ অত্যন্ত সরু। শত্রুদের আসতে হলে একে একে আসতে হবে, দঙ্গল বেঁধে আসতে পারবে না—তখনই আমাদের সুযোগ। এই সময় আপনাদের সঙ্গে যোগ দেবে আমাদের বন্ধু ইনকুবু। 'ধূসর বাহিনীর' পুরোভাগে তাঁর কুড়ুল ঝল্‌কাতে দেখ্‌লেই তওয়ালার প্রাণ শুকিয়ে উঠবে। আমি থাকবো আপনার পিছনে আমার সৈন্য দল নিয়ে। যদি দেখি আশা ভরসা নেই তবে আমিও ঝাঁপিয়ে পড়বো। অর্থাৎ শেষ আক্রমণের জন্য থাকবে রাজা।"

ইন্‌ফাদুস্‌ মানস চক্ষুতে তার বাহিনীর নিশ্চিন্ত ধ্বংস দেখতে পেয়ে অত্যন্ত ধীর ভাবেই বলে উঠলো, "সেই ভালো মহারাজ।"

ইগ্‌নোসি বলতে লাগলো, "তওয়ালার সৈন্যরা সবাই যখন এই দিককার লড়াইতে ব্যস্ত থাকবে, তখন আমাদের বাহিনীর এক তৃতীয়াংশ পাহাড়ের ডান মাথা থেকে চুপি চুপি গিয়ে ওদের বাঁ-দিকে ঝাঁপিয়ে পড়বে। আর এক তৃতীয়াংশ পাহাড়ের বাঁ-মাথা থেকে

শত্রুর ডান পাশে ঝাঁপিয়ে পড়বে। আমি যখন দেখবো যে, এই দুই মাথা এক হতে চলেছে, তখন অবশিষ্ট সৈন্য নিয়ে তওয়ালার মুখ ছেঁচে দেবো। যদি বরাতে থাকে, তবে রাত্রির আগেই তার কালো ষাঁড়দের পাহাড় থেকে তাড়িয়ে নিশ্চিন্তে 'লু'তে বিশ্রাম নেবো। এখন খাওয়া দাওয়া সেরে সেই মতো তৈরী হওয়া যাক্।

যে ব্যবস্থা এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো, কুকুয়ানাদের সুশৃঙ্খল সামরিক ব্যবস্থার গুণে তা অতি দ্রুত সম্পন্ন হওয়ার দিকে এগিয়ে চললো। এক ঘণ্টার মধ্যে খাওয়া ও রসদ বিলি হয়ে গেলো। আঠার হাজার লোক নিয়ে তিনটে দল তৈরী হলো। অধিনায়কদের সমর পরিকল্পনা বুঝিয়ে দেওয়া হলো। এই রকমে সব কাজ শেষ করে আহতদের দেখাশুনার জন্য কয়েকজন মাত্র প্রহরী রেখে আক্রমণের জন্য আমরা সবাই তৈরী হলাম।

একটু পরে গুড্, স্যার হেনরী আর আমার দিকে এগিয়ে এসে বেশ একটু অর্থপূর্ণ ভঙ্গীতেই বললো, "বিদায় বন্ধু! হুকুম অনুযায়ী আমাকে দক্ষিণ-দলের সঙ্গে যেতে হবে। জানি না আমাদের আর দেখা হবে কি না, তাই সেক্‌হ্যাণ্ড করতে এলাম।"

কোন কথা না বলে আমরা হাত মেলালাম।

"কি অদ্ভুত কাজেই না জড়িয়ে পড়েছি।" বলতে গিয়ে স্যার হেনরীর গলাটাও কেঁপে গেলো, "কালকের সূর্য আমাকে আর দেখতে হবে না বলেই মনে হচ্ছে। 'ধূসর বাহিনী'র সঙ্গে আমায় যেতে হবে—তাদেরই দায়িত্ব সবচেয়ে কঠিন। আচম্বিতে তওয়ালাকে বিপর্যস্ত করবার জন্য যে পর্যন্ত না আমাদের দুই পাশের বাহিনী মিলিত হচ্ছে, সে পর্যন্ত তাদের নিঃশেষে লড়ে যেতে হবে।"

পর মুহূর্তেই গুড্ আমাদের দু'জনের হাত চেপে ধরলো, তারপর

অদৃশ্য হয়ে গেলো। ইন্‌ফাডুস্ এসে স্যার হেনরীকে তাঁর নির্দিষ্ট জায়গায়, 'ধূসর বাহিনী'র প্রথম সারিতে নিয়ে গেলো। আমিও ইগনোসির সঙ্গে দ্বিতীয় আক্রমণ বাহিনীতে স্থান নেবার জন্য প্রস্থান করলাম।

কিছুক্ষণের মধ্যেই শত্রুর পার্শ্বদেশ আক্রমণকারী দুই বাহিনী পাহাড়ী জমির আড়ালে আড়ালে নিঃশব্দে রওনা হয়ে গেলো। ঘণ্টা খানেকের মধ্যে আর কোথাও সাড়া শব্দ জাগলো না। তারপর 'ধূসর বাহিনী'র পালা এলো।

পাকা সেনাপতি ইন্‌ফাডুস্ তার সৈন্যদের মনকে চাঙ্গা করে তোলার জন্য, তাদের কাছে কাব্য করে এক চমৎকার বক্তৃতা দিলো। তার বক্তৃতায় সমস্ত সৈন্যরা অভিভূত হয়ে উঠলো। তারপর সেটা মৃদু হতে মৃদুতর হয়ে মিলিয়ে যাবার সাথে সাথেই হঠাৎ হাজারো কণ্ঠে রাজকীয় অভিবাদন ধ্বনিত হলো "কুম"। ইগ্‌নোসি হাতের কুড়ুল তুলে সেই অভিবাদনের প্রত্যুত্তর দিলো "কুম"। তারপর তিন হাজার লোক তিন সারিতে সজ্জিত হয়ে রওনা হয়ে গেলো। তারা পাঁচশো গজ এগিয়ে যাবার পর, ইগ্‌নোসি তার দলকেও ঠিক ঐ ভাবেই সাজিয়ে নিয়ে চলবার হুকুম দিলো। আমরাও রওনা হলাম।

আমরা মালভূমির ধারে পৌঁছুতে না পৌঁছুতেই আমাদের আগের দলটি পাহাড়ের ঢাল বেয়ে সেই জিবের মতন জমির মুখের দিকে এগিয়ে গেলো। তওয়ালার শিবিরে এবার ভীষণ চাঞ্চল্য উপস্থিত হলো। আমাদের সৈন্যেরা যাতে 'লু'র সমতল ভূমিতে নামতে না পারে, সেই উদ্দেশ্যে দলে দলে সৈন্য বাধা দিতে ছুটে এলো।

ফালি জমিটা মাথা ছাড়িয়ে যেখানে আবার চওড়া হয়ে গিয়েছে, সেইখানে 'ধূসর বাহিনী'র সৈন্যরা তিন সারিতে পাথরের মূর্তির মতন

নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো। আমরা তাদের একশো গজ পিছনে সরু জমির একেবারে মাথায় ঘাঁটি নিলাম। জমিটা একটু উঁচুতে হওয়ায় সামনে দেখবার পক্ষে আমাদের খুব সুবিধা হয়ে গেলো।

তওয়ালার সৈন্যরা সরু পাহাড়ী গলি-পথে রণদুর্মদ 'ধূসর বাহিনী'কে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে থমকে দাঁড়ালো। তাছাড়া সেই পথে একবারে একটি বাহিনীর বেশী আসার উপায়ও ছিল না। কাজেই সামনের তিনটি সারির সাথে বর্শার জোর পরীক্ষা করার ইচ্ছা তাদের মধ্যে আদৌ দেখা গেলো না। কিন্তু তাদের সামনে তক্ষুনি একজন জাঁদরেল গোছের লম্বা সেনাপতি এগিয়ে এলো। তার মাথার উটপাখীর পালক আর সঙ্গে আর্দালীর বহর দেখে তাকে তওয়ালা বলেই মনে হলো। সে হুকুম দিতেই সামনের দল চীৎকার দিয়ে এগিয়ে এলো। 'ধূসর বাহিনী'র সৈন্যদের মধ্যে কোন রকম চাঞ্চল্য দেখা গেলো না। তারা আগের মতই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। শত্রুপক্ষ চল্লিশ গজ দূরে এসে তাদের দিকে উড়ন্ত কুক্‌রী ছুঁড়ে মারলো।

হঠাৎ তারা বর্শা তুলে একটা গর্জন করে উঠলো, তারপর নিমেষের মধ্যে শত্রুর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লো। সামনে খালি অসংখ্য মরণ-কামী মাথা একবার এগুতে লাগলো একবার পেছুতে লাগলো। এই রকম কিন্তু বেশীক্ষণ চললো না। কিছুক্ষণের মধ্যে আক্রমণকারীদের দল পাত্‌লা হয়ে পড়লো। সমুদ্রের একটা বড় ঢেউ যেমন করে জলের মধ্যে ডোবা পাহাড়ের মাথা অতিক্রম করে যায়, 'ধূসর বাহিনী' তাদের শত্রুকে তেমনিভাবে অতিক্রম করে গেলো। শত্রুপক্ষের সেই দলটি নিঃশেষে ধ্বংস হয়ে গেলো বটে কিন্তু 'ধূসর বাহিনী'কেও কম আঘাত হেনে গেলো না। তাদের তিনটি সারের মধ্যে একটি সারকে সম্পূর্ণ-ভাবে মাটি নিতে হলো।

কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে তারা আবার আক্রমণের জন্যে ধীরভাবে অপেক্ষা করতে লাগলো। এই সময় দূর থেকে স্যার হেনরীকে দেখতে পেলাম। এদিক ওদিক ছুটে ছুটে তিনি সৈন্য সাজাচ্ছেন। যাক এখনও বেঁচে আছেন তিনি!

ইতোমধ্যে সাদা পালক মাথায়, জাঙিয়া পরা ও সাদা ঢাল হাতে দ্বিতীয় আক্রমণকারীদল আমাদের অবশিষ্ট দু'হাজার 'ধূসর বহিনী'র দিকে ধেয়ে এলো। তারা ধীর ভাবেই প্রতিক্ষা করছিল। শত্রুপক্ষ চল্লিশ গজ তফাতে থাকতেই তারা প্রচণ্ড শক্তিতে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। কিন্তু এবারে ফলাফল ঠিক করতে অনেকখানি সময় লাগলো। একবার মনে হলো, আমাদের 'ধূসর বাহিনী'র জিতবার এবারে কোনও আশাই নেই। কারণ আক্রমণকারী দলটি একেবারে যুবক সৈন্যদের নিয়ে গঠিত হওয়াতে মনে হচ্ছিল তারা শুধু গায়ের জোরেই 'ধূসর বাহিনী'কে হঠিয়ে দেবে। আমরা সাহায্যকারী দল নিয়ে প্রায় এগিয়ে যাচ্ছিলাম। কিন্তু শৃঙ্খলা জ্ঞান, স্থৈর্য্য আর অসামান্য বীরত্বে তারা বিপদ কাটিয়ে উঠলো। পাথরের মতন অচল অটল ভাবে তারা দাঁড়িয়ে রইলো। তাদের সেই দুর্ভেদ্য পাথরের দেয়ালে বিপক্ষের বল্লমধারী যেন মাথা কুটে কুটে মরতে লাগলো। ক্রমেই শত্রুর সংখ্যা ক্ষীন হয়ে এলো।

"সাব্বাস্ মরদ!" ইগ্‌নোসি দাঁত ঘষতে ঘষতে চেঁচিয়ে উঠলো, "হো—মার দিয়া কেল্লা!"

চেয়ে দেখি শত্রুসৈন্যেরা দলে দলে দৌড় মারতে আরম্ভ করেছে; আমরা জিতেছি বটে কিন্তু অবশিষ্ট বাহিনীরও অবশিষ্ট একরকম কিছুই নেই। ছ'হাজার সৈন্য নিয়ে আমাদের আক্রমণ আরম্ভ হয়েছিল এখন বড় জোর তার ছ'শো আন্দাজ বর্শা তুলে নৃত্য করছে। আমরা

ভাবলাম যে, এই সামান্য সৈন্যদের নিয়ে এবার তারা হয়তো আমাদের দলে এসে যোগ দেবে। কিন্তু তারা ঠিক উল্টো করে বসলো। পলায়ন পর শত্রুর পিছন পিছন তারা ধাওয়া করে চললো। শ'খানেক গজ যেতে না যেতেই তওয়ালার সমস্ত দল হতভাগ্যদের একটা টিলার ওপর মরিয়া হয়ে ঘিরে ধরলো।

আমি তাই দেখে বলে উঠলাম, "ইগ্‌নোসি, চোখের সামনে, তওয়ালা আমাদের ভাইদের গিলে খাক্, তুমি কি আমাদের দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাই দেখতে বলো ?"

"না মাকুমাজাহন্ না," সে উত্তর করলো, উপযুক্ত সময় খুঁজছিলাম শুধু! এবার দেখুন।"

ইগ্‌নোসি অতঃপর তার কুড়ুলখানা মাথার ওপর ঘুরিয়ে এগুবার হুকুম দিলো আর সঙ্গে সঙ্গে আমরাও সমুদ্রোচ্ছ্বাসের মতন ঝাঁপিয়ে পড়লাম।

তারপর যা ঘটলো তা আমার বলবার ক্ষমতা নেই। তবে আমার এইটুকু মনে আছে যে আমরা সুশৃঙ্খলার সঙ্গে প্রচণ্ডভাবে ধেয়ে চললাম। পায়ের তলায় মাটি কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগলো। এই অতর্কিত আক্রমণ শত্রুসৈন্যের পক্ষে মারাত্মক হয়ে উঠলো। চারদিক থেকে একঅস্পষ্ট কোলাহল কানে বাজতে লাগলো। রক্ত কুয়াসার মধ্যে বর্শা ফলকের ঝল্‌কানি চোখ ধাঁধিয়ে দিতে লাগলো।

একটু ধাতস্থ হলে নিজেকে সেই টিলার ওপর অবশিষ্ট 'ধূসর বাহিনী'র মধ্যে স্যার হেনরীর পিছনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। কেমন করে যে আমি সেখানে পৌঁছুলাম সে সম্বন্ধে আমার কোন ধারণাই ছিল না। স্যার হেনরীর মুখে পরে শুনেছিলাম যে আমাদের দলের ভীষণ আক্রমণের প্রথম তোড়ের মুখে আমি প্রায় ছিট্‌কে তাঁর পায়ের কাছে

এসে পড়েছিলাম। আবার বিপক্ষের ধাক্কায় পিছু হঠবার সময়ও ঐখানে ঐভাবেই পড়েছিলাম। ব্যাপারটা তাঁর নজরে পড়াতে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়ে আমাকে দলের মধ্যে টেনে নেন।

যুদ্ধ ক্রমেই ভীষণ হতে ভীষণতর হয়ে উঠতে লাগলো শত্রু সৈন্যরা ঢেউয়ের পরে ঢেউয়ের মতন আসতে লাগলো। সেই আক্রমণের সামনে আমাদের দলের সৈন্য সংখ্যা ক্রমেই কমে আসতে লাগলো। তবু বারবার পাল্টা আক্রমণে আমরা তাদের হঠিয়ে দিতে লাগলাম। কিন্তু তাদের শেষ নেই। সেই মরার পাহাড় ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে তারা আসতে লাগলো। আমাদের বর্শার হাত থেকে বাঁচবার জন্যে সঙ্গীদের মরা দেহ তুলে সামনে ঢালের মতন করেও তারা অনেক এগুতে লাগলো বটে, কিন্তু ফিরতে পারলো না কোন মতেই। মৃতের সংখ্যা শুধু বাড়িয়ে চললো।

হঠাৎ সৈন্যদের মধ্যথেকে রব উঠলো; "তওয়ালা—ই—তওয়ালা!" আমরা দেখতে পেলাম দলের মধ্যথেকে সামনে লাফিয়ে পড়লো দৈত্যের মতন বিরাটকায় তওয়ালা মহারাজ। হাতে ঢাল আর লড়্য়ে কুড়ুল আর গায়ে লোহার জালের বর্ম।

"কোথায় সেই সাদা লোকটা কোথায় সে; যে আমার ছেলে স্ক্রাগ্‌গাকে খুন করেছে?" এই বলে চীৎকার করতে করতেই স্যার হেনরীর দিকে একটা তোলা ছুঁড়ে মারলো। সৌভাগ্যবশতঃ স্যার হেনরী সেটা দেখতে পেয়েছিলেন, তাই তাড়াতাড়ি তিনি তাঁর ঢালটা বাড়িয়ে দিলেন। তোলাটা তাঁর ঢালে বিঁধে ঝুলতে লাগলো।

তারপর একটা হুঙ্কার করে তওয়ালা সোজা তাঁর ওপর ঝাপিয়ে পড়লো, আর সঙ্গে সঙ্গে হাতের কুড়ুল দিয়ে তাঁর ঢালের ওপর এত

প্রচণ্ড জোরে আঘাত করলো যে, তার ধাক্কায় স্যার হেনরীর মতন শক্তিমান লোকও হুমড়ি খেয়ে হাঁটুগেড়ে বসে পড়লেন।

এর বেশী তখন আর কিছুই হলো না। কারণ আমাদের চারপাশের শত্রুসৈন্যদের মধ্যথেকে একটা হায় হায় রব উঠলো। চেয়ে দেখি আমাদের ডান দিক আর বাঁদিকের মাঠ, শত্রুসৈন্য-আক্রমণকারীদের মাথার পালকে ছেয়ে গেছে। সেই আগেকার পরিকল্পনা অনুযায়ী আমাদের সৈন্যরা পাশ থেকে আক্রমণ সুরু করেছে। উপযুক্ত সময়ে আমাদের দুই মাথা এক হতে চলেছে। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই যুদ্ধের ফলাফল স্থির হয়ে গেলো। দুই পাশে ও সামনে থেকে ঘা খেয়ে, তওয়ালার সৈন্যরা লেজ গুটিয়ে পালাতে আরম্ভ করলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই 'লু' এবং আমাদের মধ্যে ব্যবধান রইলো শুধু একটা সমতল ভূমির। তার ওপর দিয়ে ইতস্ততঃ তখনও কয়েক দল সৈন্য প্রাণভয়ে পালাচ্ছে। চারদিকে মৃত আর মুমূর্ষুর পাহাড়। সে দৃশ্য ভোলা যায় না।

"মরদ!" একটা ক্ষত বাঁধতে ইন্‌ফাদুস্, সেই অবশিষ্ট সৈন্যদের লক্ষ্য করে ধীর ভাবে বললো, "দলের নাম রেখেছিস্। আজকের দিনের লড়াইয়ের কথা তোদের ছেলের-ছেলের মুখে শুনতে পাওয়া যাবে রে, শুনতে পাওয়া যাবে।" তারপর স্যার হেনরীর দিকে ফিরে তাঁর হাতে একটা ঝাকি দিয়ে সে বললো, "হ্যাঁ, আচ্ছা জোয়ান বটে, ইনকুবু! সৈন্যদের সঙ্গে আমার জীবন কেটে গেলো, সাহসী লোকও অনেক দেখেছি, কিন্তু আপনার মতন আর একটা লোকও আজ পর্যন্ত চোখে পড়েনি।"

ইগ্‌নোসি তার দল নিয়ে এই সময় 'লু'র দিকে মার্চ করে এগিয়ে গেলো। সম্ভব হলে তওয়ালাকে বন্দী করে জয় সম্পূর্ণ করারই তার

ইচ্ছা। আমাদের 'ওপর হুকুম এলো তার সঙ্গে মিলিত হবার! অবশিষ্ট 'ধূসর বাহিনী'কে আহতদের সেবায় নিযুক্ত করে' আমরা যাত্রা করলাম। খানিকটা দূর গিয়েই চোখে পড়লো মিঃ গুড্ আমাদের কাছ থেকে প্রায় একশো-পা দূরে একটা উই ঢিবির ওপর বসে আছে। কাছেই তার পাশে একটা কুকুয়ানার দেহ পড়ে আছে।

ওকে দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে স্যার হেনরী মন্তব্য করলেন, "গুড্ বোধ হয় আহত হয়েছে।" তাঁর কথা শোনা মাত্র সেই মরা সৈনিকটা তড়াক করে লাফিয়ে উঠে গুডের মাথায় এক বাড়ি মেরে উই ঢিবি থেকে ফেলে দিলো। ফেলে দিয়েই বর্শা দিয়ে খোঁচাতে লাগলো। আমরা ভয়ে ছুটে গেলাম। কাছে গিয়ে দেখি যে তাগ্ড়া জোয়ানটা গুডের দেহে খোঁচার ওপর খোঁচা দিয়ে চলেছে। আর প্রত্যেক বার খোঁচা খেয়ে গুড্ তার হাত পা গুলো আকাশের দিকে ছুঁড়ছে। আমাদের আসতে দেখে লোকটা শেষ মোক্ষম এক ঘা বসিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো, "মার ভেল্কীবাজটাকে।" তারপর ছুটে পালালো। গুডের আর কোনও সাড়া পাওয়া গেলো না। আমরা ভাবলাম তার হয়ে গেছে। আমরা মুষড়ে পড়লাম। কাছে গিয়ে দেখি গুড্ মূর্চ্ছায় বিবর্ণ হয়ে গেছে কিন্তু মুখে তার সেই মৃদু হাসি আর চোখে চশমাটা তার তখনও ঠিক লেগে আছে।

আমাদের ঝুঁকে পড়া মুখ দেখতে পেয়ে বলে উঠলো "চমৎকার বর্ম!" তারপরই আবার মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লো। আমরা পরীক্ষা করে বুঝতে পারলাম যে, শত্রুসৈন্যের পিছু নেবার সময় তার পা'টা 'তোলা' লেগে জখম হ'য়ে গিয়েছিল। কিন্তু লোহার বর্মটা গায়ে থাকবার জন্য শেষে আততায়ীর বর্শা তার ক্ষতি করলেও মারাত্মক রকমের কিছু ঘটতে দেয়নি। ভগবানের দয়াতেই সে কোনক্রমে বেঁচে গেছে।

উপস্থিত ক্ষেত্রে করার কিছু ছিল না। তাই আহতদের বহন করবার জন্যে বেতের যে ঢাল ব্যবহার করা হচ্ছিল, তারই একটাতে তাকে শুইয়ে আমাদের সঙ্গে নিয়ে আসতে বললাম।

'লু'র প্রবেশ পথে আমাদের পক্ষের সৈন্যদেরই হুকুম মত পাহারায় দেখতে পেলাম। সৈন্যদের অধিনায়ক, ইগ্‌নোসিকে স্যালুট করে জানালো যে, রাজা তওয়ালা ও তার সৈন্যরা সব সহরের মধ্যেই আশ্রয় নিয়েছে। তবে সৈন্যদের ফের লড়াই করবার মত মনোবল নেই, তাছাড়া তারা আত্মসমর্পন করতেও রাজী। কথা শুনে ইগ্‌নোসি আমাদের পরামর্শ ক্রমে শহরের প্রত্যেক ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে খবর পাঠিয়ে দিলো যে সৈন্যরা যদি আত্মসমর্পন করে তা হলে সে তাদের প্রাণ ভিক্ষা দিতে রাজী আছে। এই ঘোষনার ফল হাতে হাতেই পাওয়া গেলো। অল্পক্ষণের মধ্যেই সহরের প্রবেশপথে গড় খাইয়ের ওপর টানাপুল পড়তে দেখে আমাদের সৈন্যরা উল্লাসে নৃত্য করে উঠলো।

বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে সযত্নে সবরকম ব্যবস্থা করে আমরা সহরে প্রবেশ করলাম। কয়েকদিন আগে যেখানে আমরা ভয়ঙ্কর ডান্-শিকার দেখেছিলাম, ক্রমে ক্রমে সেইখানে এসে পৌঁছুলাম। সেই বিরাট প্রাঙ্গণে—জন প্রাণীও দেখা যায় না। তবে একদম ফাঁকা বলাও যায় না। কারণ দূরে রাজকুটীরের সামনে তওয়ালাকে বসে থাকতে দেখলাম। তার পাশে আজ বুড়ী গাগুল ছাড়া আর কোনও সঙ্গীই নেই।

আমাদের দেখে তওয়ালা এই প্রথম তার মাথার পালক উঁচু করলো। মাথায় বাঁধা হীরের মতই তার এক চোখ বিজয়ী প্রতিদ্বন্দী ইগ্‌নোসির দিকে চেয়ে রুদ্ধ রাগে ঝল্‌সে উঠলো।

একটা তীব্র ব্যঙ্গের সুরে সে বলে উঠলো "আসুন মহারাজ, আসুন! আমারই নিমক খেয়ে, আমারই সৈন্যদের ফুঁসলিয়ে নিয়ে, ঐ সাদামানুষদের সাহায্যে আমার সর্বনাশ করেছেন! এখন বলুন হুজুর, আমার কপালে কি আছে ?"

"আমার বাবার কাপালে যা ঘটিয়ে তুমি তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করেছিলে, তোমার কপালেও তাই আছে।" ইগ্‌নোসির কণ্ঠ থেকে কঠিন জবাব এলো।

"উত্তম কথা। মরতে আমি তৈরীই আছি। তবে রাজা তোমার কাছে আমি একটি প্রার্থনা করছি যে, কুকুয়ানা-রাজবংশের মর্যাদানুযায়ী তুমি আমাকে যুদ্ধ করে মরার সুযোগ দেবে। তা যদি না দাও, তবে যে সব কাপুরুষরা যুদ্ধ থেকে পালিয়ে এসে তোমার দলে ভিড়েছে তারাও তোমার নিন্দে করবে।"

"মঞ্জুর করলাম প্রর্থনা। কার সঙ্গে তুমি লড়তে চাও ? আমার সঙ্গে ? আমি তোমার সঙ্গে লড়াই করবো না, কারণ, যুদ্ধ ছাড়া রাজারা অস্ত্র ধরে না।"

তওয়ালার জলন্ত চোখ আমাদের সমস্ত দলের মধ্যে কাকে যেন খুঁজে বেড়াতে লাগলো। তারপর হঠাৎ সে স্যার হেনরীর দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো, "ইনকুবু, আমরা সকালে যে লড়াই আরম্ভ করেছিলাম তা এখন শেষ হয়ে যাক, কি বলো ? না, আমি তোমাকে ভীরুর ভীরু কাপুরুষ ব'লে ঢাকবো—?"

ইগ্‌নোসি তাড়াতাড়ি মাঝপথে বাধা দিয়ে উঠলো, "না, তা হবে না—ওঁর সঙ্গে তুমি লড়তে পাবে না।"

হ্যাঁ, ও যদি ভয় পায় তবে থাক!" তওয়ালা বিদ্রূপ করে উঠলো।

স্যার হেনরী বোধ হয় তার মন্তব্য বুঝতে পারলেন, এবং কথাটা

শোনা মাত্রই তাঁর মুখ লাল হয়ে উঠলো। তিনি বলে উঠলেন, "আমি লড়বো—ওকে দেখিয়ে দিতে চাই কে ভীরু!"

ইগ্‌নোসি তাঁর হাত জড়িয়ে ধরে নিতান্ত নিকট আত্মীয়ের মতই তাঁকে এই ভয়াবহ দ্বন্দযুদ্ধ থেকে প্রতিনিবৃত্ত করার চেষ্টা করতে লাগলো। কিন্তু স্যার হেনরীর এক কথা।

"ভালো কথা ইনকুবু, তোমার সাহস আছে—জোর লড়াই হবে। এসো, শের তওয়ালা তোমার জন্য তৈরী।"

এই কথা বলে তওয়ালা একটা বিকট হিংস্র হাসি হেসে উঠলো। তারপর এগিয়ে এসে স্যার হেনরীর সামনে দাঁড়ালো। অস্তগামী সূর্যের শেষ আভা তাদের দুই বিরাট দেহে আগুন জ্বালিয়ে তুললো। দুজনে দুই লড়ু'য়ে কুড়ুল মাথার ওপর তুলে, বৃত্তাকারে পাক খেতে খেতে উভয়ে উভয়কে আঘাত হানার সুযোগ খুঁজতে লাগলো।

হঠাৎ স্যার হেনরী সামনের দিকে লাফিয়ে পড়ে তওয়ালাকে লক্ষ্য করে একটা প্রচণ্ড আঘাত হানলেন। তওয়ালা এক পাশে সরে গেলো। কিন্তু স্যার হেনরী তাঁর ঝোঁক সামলাতে পারলেন না। তওয়ালা সঙ্গে সঙ্গে এর সুযোগ গ্রহণ করলো। বিরাট কুড়ুল মাথার ওপর ঘোরাতে ঘোরাতে সে তার সমস্ত শক্তি দিয়ে পাল্টা আঘাত করলো। আমার প্রাণ খাঁচা ছাড়া হয়ে গেলো—ভাবলাম সব শেষ—কিন্তু স্যার হেনরী চক্ষের পলকে নিজেকে সামলে নিয়ে বাঁ হাতের ঢাল দিয়ে সেই ভয়াবহ অব্যর্থ আঘাত প্রতিরোধ করলেন। তবু তওয়ালার সেই প্রচণ্ড আঘাতে ঢালের বাইরের দিকটা কেটে চোক্‌লা হয়ে গিয়ে কুড়ুল তাঁর বাঁ কাঁধে গিয়ে বসলো। তবে সৌভাগ্যবশতঃ মারাত্মক রকমের কিছু ঘটলো না। পরমুহূর্তেই স্যার হেনরী এক ঘা বসালেন। এবারেও তওয়ালা সেটা আট্‌কে দিলো। এরপর কয়েকবার একজন মারে,

অন্যজন আটকায় এমনি ভাবে চললো। কখনও কুড়ুল ঢালের ওপর এসে ঘা খায় কখনো বা দুজনেই আঘাত এড়িয়ে চলে। কিন্তু উত্তেজনা ক্রমেই তীব্র হয়ে উঠলো। সমবেত সৈন্যরা তাদের শৃঙ্খলা ভুলে গিয়ে দুই প্রতিদ্বন্দ্বীকে ঘিরে ধরলো। কুঠারের প্রতিটি আঘাতে তারা কখনও চীৎকার করে উঠতে লাগলো, কখনো 'আ—উঃ' করে গুমরাতে লাগলো।

এই সময়ে গুড্ চেতনা ফিরে পেয়ে এবং লড়াই দেখে উত্তেজনায় উঠে দাঁড়ালো। তারপর আমার হাত ধরে এক পায়েই লাফিয়ে লাফিয়ে স্যার হেনরীকে উৎসাহিত করার জন্য চেঁচাতে লাগলো। আমিও তার পিছনে পিছনে ঘুরতে লাগলাম।

অল্পক্ষণের মধ্যেই স্যার হেনরী তওয়ালার একটা আঘাত ঢাল দিয়ে প্রতিরোধ করে এমন একটা প্রচণ্ড পাল্টা আঘাত করলেন যে, সে আঘাতে কুড়ুলটা তওয়ালার ঢাল কেটে, লৌহ বর্ম ভেদ করে তার কাঁধে গিয়ে লাগলো। যন্ত্রণায় ও রাগে চীৎকার করতে করতে তওয়ালা সুদসমেত সে আঘাত ফিরিয়ে দিলো। সে তার সমস্ত শক্তি দিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীর ওপরে এমন আঘাত হানলো যে, স্যার হেনরীর কুড়ুলের অমন গণ্ডারের সিং আর লোহার তৈরী হাতল দু'আধখানা হয়ে গেলো। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মুখটাও বেশ ভালো রকমেরই জখম হলো।

স্যার হেনরীর হাত থেকে কুড়ুল পড়ে যেতে দেখে আমাদের দলের সব হায় হায় করে উঠলো। তওয়ালা হুঙ্কার দিয়ে তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। আমি চোখ বুজে ফেললাম। যখন খুললাম তখন স্যার হেনরীর ঢালখানা মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে, আর তিনি নিজে তাঁর দুটি বিরাট বাহুদিয়ে তওয়ালার কোমর জড়িয়ে ধরেছেন। দু'জনের

জংলী ভালুকের মতন সে কি ঝটাপটি! প্রাণের চেয়ে সেই মানের লড়াই ভয়ঙ্কর হয়ে উঠলো। একটা প্রচণ্ড ঝট্কায় তওয়ালা স্যার হেনরীকে নিয়ে মাটিতে পড়লো। চুন ছিটানো আঙ্গিনার ওপর গড়াগড়ি খেতে খেতেই তওয়ালা চেষ্টা করতে লাগলো কেমন করে সে স্যার হেনরীর মাথায় কুড়ুলখানা বসিয়ে দেবে, আর স্যার হেনরী চেষ্টা করতে লাগলেন তওয়ালার বর্মের মধ্য দিয়ে কেমনকরে' তোলা'টা টেনে নামিয়ে দেবেন।

গুড্ চীৎকার করে উঠলো, "ওর কুড়ুল ধরুন—কুড়ুল ধরুন।" বোধহয় কথাটা স্যার হেনরীর কানে গেলো। তিনি তোলা ফেলে দিয়ে তওয়ালার কব্জীতে মোষের চামড়া দিয়ে বাঁধা কুড়ুলের হাতলটা ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করতে লাগলেন। বন বিড়ালের কামড়া-কামড়ির মতন সেই কুড়ুলের জন্য তাঁরা গড়াগড়ি দিতে লাগলেন। তাঁদের ভারী নিঃশ্বাসের ফোঁস ফোঁস আওয়াজ স্পষ্ট কানে এসে লাগতে লাগলো। হঠাৎ তওয়ালার কুড়ুলের চামড়ার ফিতেটা পট্ করে ছিঁড়ে গেলো। স্যার হেনরী একটা প্রচণ্ড জোরে ঝট্কা মেরে নিজেকে মুক্ত করে নিলেন। এবং পরক্ষণেই ক্ষিপ্রতার সঙ্গে কুড়ুল হাতে পায়ের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন। তাঁর মুখের সেই আঘাত লাগা জায়গাটা থেকে তখন দর্‌দর্ করে রক্ত ঝরে পড়ছে। তওয়ালার অবস্থাও প্রায় তাই। কুড়ুল হাতছাড়া হওয়াতে তওয়ালা একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। কোমর থেকে প্রকাণ্ড তোলাখানা টেনে নিয়ে টল্‌তে টল্‌তে সে সোজা স্যার হেনরীর বুকে সজোরে বসিয়ে দিলো। সেই মারাত্মক আঘাত স্যার হেনরীর বর্মে এসে লাগলো।

কে এই বর্ম তৈরী করেছিল জানি না—তবে এইটুকু বলতে পারি সে তার বর্ম-নির্মানের যথার্থ কলা-কৌশলই এর ওপর প্রয়োগ

করেছিল। কারণ তওয়ালার সেই প্রচণ্ড আঘাতও বর্মে প্রতিহত হয়ে ফিরে এলো। স্যার হেনরী প্রবল ধাক্কায় কাঁপতে কাঁপতে পিছিয়ে গেলেন। তওয়ালা অস্ত্রখানা ধরে একটা জংলী জানোয়ারের মতন চীৎকার করে আবার তাঁর দিকে ধেয়ে গেলো। ইতোমধ্যে স্যার হেনরী অনেকটা সামলে উঠেছিলেন। তওয়ালা কাছে আসতেই কুড়ুলখানা মাথার ওপর ঘুরিয়ে সজোরে তিনি তার ঘাড়ের ওপর এক কোপ বসিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে হাজারো গলা দিয়ে একটা অস্বাভাবিক উত্তেজনার চীৎকার বেরিয়ে এলো—তওয়ালার মুণ্ডুটা যেন চক্ষের নিমেষে ধড় থেকে লাফিয়ে উঠেই মাটির্তে পড়ে গড়াতে গড়াতে ইগ্‌নোসির পায়ের কাছে গিয়ে থেমে গেলো। আর ধড়টা মুহূর্তের জন্য খাড়া থেকে ধড়াস্ করে পড়ে গেলো।

স্যার হেনরী রক্তমোক্ষণ ও পরিশ্রমে এত কাহিল হয়ে পড়েছিলেন যে, তিনিও আর নিজেকে সামলাতে পারলেন না। তওয়ালার কবন্ধ দেহের ওপরেই মুর্চ্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন।

সঙ্গে সঙ্গে লোক্‌জনেরা তাঁকে তুলে মুখে চোখে জল দিতে লাগলো। মিনিট খানেকের মধ্যেই তিনি চোখ মেলে চাইলেন। যাক্ তিনি বেঁচে আছেন! সকলের স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়লো।

সূর্য তখন সবেমাত্র ঢলে পড়েছে। আমি তওয়ালার কাটা মুণ্ডুটার কাছে গিয়ে তার মাথায় বাঁধা হীরেটা খুলে নিয়ে প্রকৃত রাজার হাতে অর্পণ করলাম। ইগনোসি রাজ-প্রতীকটি কপালে বেঁধে নিলো। তারপর তওয়ালার মরা দেহের কাছে গিয়ে, একখানা পা তার কন্ধকাটা বিশাল বুকের ওপর তুলে দিয়ে গোধূলির আলোকে বিজয়-সূচক এক অদ্ভুত স্তোত্র আবৃত্তি করতে লাগলো।

মরণাপন্ন গুড্

স্যার হেনরী আর গুড্কে ঐ অবস্থাতেই তওয়ালার পরিত্যক্ত কুটীরের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হলো। আমিও তাঁদের সঙ্গে সেখানে গেলাম। অতি পরিশ্রমে আর রক্তপাতের দরুণ তাঁদের অবস্থা একেবারে কাহিল হয়ে পড়েছিল। আমার নিজের অবস্থাও খুব ভালো বোধ করছিলাম না। তবুও এই কথাই মনে করে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করছিলাম যে, মাঠে ম'রে প'ড়ে না থেকে এখনো নিজের দুর্ভাগ্যের কথাটাও চিন্তা করতে পারছি।

ফৌলতার সাহায্যে অনেক কষ্টে আমরা লোহার জামাগুলো গা থেকে খুলে ফেলে দিলাম। নিঃসন্দেহে সেদিন এই গুলিই আমাদের জীবন রক্ষা করেছিল। যা ভেবে ছিলাম জামা খুলে ঠিক তাই চোখে পড়লো। গায়ের মাংস ভীষণভাবে থেঁতলে গেছে। স্যার হেনরী আর গুডের দিকে চাওয়া যায় না। তাঁদের সর্বাঙ্গ যেন কে ছেঁচে দলা দলা করে দিয়েছে। ফৌলতা কি একটা সুগন্ধি পাতা বেটে নিয়ে এলো। সেটা মলমের মতন লাগাতে আমরা অনেকটা আরাম বোধ করতে লাগলাম।

আমাদের উঠে যাবার আর শক্তি ছিল না। ফৌলতা খানিকটা বলকারক সুরুয়া এনে দিলো; আমরা তাই কোন রকমে গিলে ঘরের মধ্যে বিছানো লোমের কম্বলের ওপর গা এলিয়ে দিলাম। কিন্তু ঘুমানো

অসম্ভব হয়ে উঠলো। চারিদিক থেকে স্বামীহারা, পুত্রহারা, ভাইহারা, মেয়েদের করুণ কান্না ভেসে আসতে লাগলো। যারা আর কোনদিন ফিরবে না তাদের জন্যে সেই বুক-ফাটা কান্না শুনতে শুনতে মন ভারী হয়ে উঠলো।

অবশেষে কোন রকমে রাত্রি প্রভাত হলো। বুঝতে পারলাম আমার মতই বন্ধুদেরও রাতে অনিদ্রায় কাটাতে হয়েছে। ভোরের দিকে গুডের অবস্থা সাংঘাতিক হয়ে উঠলো। তার পায়ের মাংসল জায়গাটা একেবারে এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে গিয়েছিল। সেটা এবার বিষিয়ে ওঠাতে তার জ্বর খুব বেড়ে গেলো। সে প্রলাপ বকতে সুরু করে দিলো। তার বমিকরা দেখে আমি আরও ভয় পেয়ে গেলাম। স্যার হেনরী তাঁর মুখের ক্ষতটার জন্য যদিও মোটেই হাসতে বা খেতে পারছিলেন না, তবুও তাঁকে বেশ তাজাই বোধ হচ্ছিল।

সকালের দিকে ইগ্‌নোসি আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এলো। তার কপালে রাজকীয় প্রতীক তখন জ্বল্ জ্বল্ করছে।

আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, "জয় মহারাজ, জয় হোক।"

"হ্যাঁ মাকুমাজাহন্, আপনাদের তিনটি দক্ষিন বাহুর বলেই আমি শেষ পর্যন্ত রাজা হতে পেরেছি।" সঙ্গে সঙ্গে সে উত্তর করলো।

তার কথায় বুঝতে পারলাম যে সবই বেশ ভালো ভাবেই চলছে। দুই সপ্তাহের মধ্যেই সে তার রাজ্যাভিষেকের সব ব্যবস্থাও করে ফেলবে।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "গাগুলের কি ব্যবস্থা হবে?"

ইগ্‌নোসি উত্তর করলো, "এই দেশে ও এক দুষ্টগ্রহ বিশেষ, আমি ওকে আর ওর চেলাচামুণ্ডাদের সব হত্যা করবো।"

"তবু সে অনেক জানেশোনে একথা মানতেই হবে," আমি উত্তর

করলাম, "জ্ঞানের বস্তুকে নষ্ট করা সহজ ইগ্নোসি, রক্ষা করা কঠিন।"

সে একটু চিন্তা করে বললো, "তাই বটে, একমাত্র সে-ই জানে এই বিরাট সড়ক কোন্ দিকে গেছে; কোথায় রাজাদের সমাহিত করা হয় আর কোথায় সেই নির্বাক দেবতাদের আসন!"

"হ্যাঁ, আরো জানে কোথায় হীরে পাওয়া যায়। ইগ্নোসি তোমার প্রতিজ্ঞার কথা বোধ হয় ভুলে যাওনি। আমাদের সেই হীরের খনিতে নিয়ে যাবার জন্যে যদি গাগুলের প্রাণ বাঁচানোর দরকার হয় তাও তোমাকে করতে হবে।"

"সেকথা আমি ভুলবো না মাকুমাজাহন্। আর আপনি এখন যা বলছেন সে সম্বন্ধে আমি ভেবে দেখবো।"

ইগ্নোসি চলে গেলে আমি গুড্কে দেখতে গিয়ে দেখি তার প্রলাপবকা বেড়ে গেছে। চার পাঁচদিন ধরে তার অবস্থা ঐ রকম সাংঘাতিক ভাবেই চললো। আমার বিশ্বাস এই সময় ফৌলতার অক্লান্ত সেবা না পেলে তার বাঁচাই কঠিন হয়ে পড়তো।

দু'দিন গুডের অবস্থা এমন হয়ে উঠলো যে সে প্রায় যায়-যায়। আমরা নিরাশ হয়ে নিঃশব্দে খালি পায়চারী করতে লাগলাম।

ফৌলতা খালি বলতে লাগলো, "ও বাঁচবে, বাঁচবে।"

পাঁচদিনের দিন রাত্রে আমি রোজ যেমন গুড্কে দেখতে যাই, সেই রকম দেখতে গেলাম। পা টিপে টিপে ঘরে ঢুকলাম। মেঝের ওপর একটা মৃদু আলো জ্বলছে। দেখলাম, গুডের দেহে আর কোনও অস্থিরতা নেই, একেবারে নিঃসাড় হয়ে পড়ে আছে সে।

তা-হলে সব শেষ হয়ে গেছে! বুকের মধ্যে আমার কেমন

মোচড় দিয়ে উঠলো, আমার গলা দিয়ে চাপা কান্নার একটা আওয়াজ বেরিয়ে এলো।

"হুস্‌-স্‌-স্‌!" গুডের মাথার কাছে অন্ধকারের মধ্যথেকে একটা আওয়াজ এলো।

আমি খুব কাছে এগিয়ে গিয়ে দেখি গুড্ সত্যিই মরেনি। মরার মতন নিঃসারে ঘুমিয়ে পড়েছে। আর ঘুমের ঘোরে ফৌলতার আঙ্গুলেরডগা শক্ত করে ধরে আছে। বিপদ কেটে গেছে। এবারে ওর অবস্থা ভালোর দিকেই যাবে। এমনিভাবে গুড্ প্রায় আঠারো ঘণ্টা ঘুমিয়ে রইলো। আর এই সমস্তক্ষণ ধরে শুশ্রূষা পরায়ণা ফৌলতা ঠায় ঐ ভাবে বসে রইলো। তার ভয় নড়লে পাছে গুডের ঘুম ভেঙ্গে যায়। গুডের ঘুম ভাঙবার পর ফৌলতাকে ধরাধরি করে উঠিয়ে নিয়ে যেতে হলো। কারণ একভাবে বসে থাকার জন্য তার হাত-পায়ে এমন খিল ধরে গিয়েছিল যে, তার আর নড়বার শক্তি ছিল না।

গুডে্র অসুখের অবস্থা একবার মোড় ফিরতেই তার সেরে উঠতে আর বিশেষ দেরী লাগলো না। ভালো হয়ে উঠবার পর একদিন স্যার হেনরী গুড্‌কে বললেন, এ যাত্রায় তার জীবনের জন্যে ফৌলতার কাছে সে কত ঋণী। বিশেষ করে তিনি যখন ফৌলতার একনাগাড়ে আঠারো ঘণ্টা ঠায় বসে থাকার কথা বললেন, বেচারা গুডের চোখ জলে ভরে উঠলো। সে সেখান থেকে উঠে সোজা আমাকে নিয়ে ফৌলতার কুটীরের দিকে ধন্যবাদ জানাবার জন্য ছুট্‌লো।

* * * *

এই ঘটনার পর, ইগ্‌নোসির অভিষেক-উৎসব, অনুষ্ঠান শেষ হয়ে গেলো। আমরা এবার ইগনোসিকে জানালাম. যে, সলোমনের যে

পথ তার ধনভাণ্ডারের দিকে গেছে তার রহস্য ভেদ করার জন্য আমরা বড় আকুল হয়ে পড়েছি। এ সম্বন্ধে সে কিছু খোঁজ খবর জোগাড় করতে পারলে কিনা তাও তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো।

"বন্ধুগণ" সে জবাব দিলো, "আমি এইটুকু কেবল খোঁজ পেয়েছি যে, সেখানে তিনটি মূর্তি আছে; তাঁরাই এদেশে নির্বাক দেবতা নামে পরিচিত। এঁদেরই কাছে বলি দেবার জন্য তওয়ালা ফৌলতাকে বাছাই করেছিল। ওখানে এক মস্ত গুহা আছে। সেই গুহার মধ্যে এদেশের রাজাদের সমাধিস্থ করা হয়। সেখানে তওয়ালার দেহও আপনারা দেখতে পাবেন। ওখানে একটা গভীর গর্তও আছে। অতীতে কোন লোক হয়তো, আপনারা যে পাথরের কথা বলছেন, তারই জন্য খুঁড়ে থাকবে। এই পাথরের কথা কিম্বার্লীতে থাকার সময়ও আমি শুনেছি। এই মৃত্যুপুরীতে একটি এমন গোপন কুঠুরী আছে যে, যার কথা এদেশে রাজা আর গাগুল ছাড়া আর কেউই জানে না। তওয়ালা তো মরেই গেছে—এখন রাজা আমি। কিন্তু এ বিষয়ে আমি কিছুই জানি না। তবে এদেশে এই রকম কিম্বদন্তী আছে যে, কয়েকপুরুষ আগে একজন সাদামানুষ পাহাড় ডিঙিয়ে এসেছিল। এদেশের একজন স্ত্রীলোক তাকে সেই চোরকুঠুরীতে পথ দেখিয়ে নিয়ে ধন-রত্ন দেখায়। কিন্তু সাদামানুষটি ধনরত্ন নেবার আগেই স্ত্রীলোকটি বিশ্বাসঘাতকতা করে। তখনকার রাজা তাকে তাড়িয়ে পাহাড় পার করে দিয়ে আসে। সেই থেকে সেখানে কোন লোক প্রবেশ করেনি।"

"কাহিনী যে মিথ্যে নয় এ সম্বন্ধে আমরা একরকম নিশ্চিত হইগ্নোসি। কারণ পাহাড়ে আমরা তো সেই সাদামানুষটিকে দেখতে পেয়েছি।" আমি বললাম।

"হ্যাঁ দেখেছিলাম বটে। আমি আপনাদের কথা দিয়েছি যদি আপনারা সেই ধনভাণ্ডারে পৌঁছুতে পারেন আর যদি এখনও সেখানে মণি-মাণিক্য থেকে থাকে—"

"তোমার কপালের হীরেটাই এর প্রকৃষ্ঠ প্রমাণ যে তা এখনও ঐখানেই আছে।" আমি তার কপালে যে বড় হীরেটা বাঁধা ছিল সেইটার দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বলে উঠলাম।

"থাকতে পারে" সে জবাব দিলো, "যদি সেখানে থাকেই তবে যত ইচ্ছে তা আপনারা নিয়ে যাবেন, কিন্তু আমাকে আপনাদের ছেড়ে দিতে হবে, দোহাই আপনাদের।"

"প্রথমে আমাদের সেই গুপ্তস্থানটি তো খুঁজে বের করতে হবে।" আমি উত্তর করলাম।

"একজনই কেবল আপনাদের তা দেখিয়ে দিতে পারে—সে হচ্ছে গাগুল।"

"যদি সে রাজী না হয়?"

"তবে সে মরবে।" ইগ্‌নোসি দৃঢ়ভাবে উত্তর করলো "হ্যাঁ দাঁড়ান, তাকে দুটোর একটা বেছে নিতে দিন।" এই কথা বলে ইগ্‌নোসি গাগুলকে তার সামনে আনতে হুকুম করলো।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই দুজন প্রহরী তাকে টান্‌তে টান্‌তে নিয়ে এলো। চলতে চলতে গালাগাল আর অভিসম্পাতের চোটে গাগুল প্রহরীদের চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার করে দিলো।

প্রহরীরা ছেড়ে দেওয়া মাত্র একটা শুকনো পোঁটলার মতন সে ধপ্ করে মাটিতে বসে পড়লো।

"আমাকে দিয়ে আবার কি দরকার তোর ইগ্‌নোসি?" সে খ্যান্ খ্যান্ করে উঠলো। "আমার গায়ে হাত তুলে বুকেরপাটা দেখাসনি,

খবর্দার। আমার গায়ে হাত দিয়েছিস কি, যেমন আছিস অমনি মরবি! জানিস আমার যাদু—সাবধান হ'।"

"তোর ওসব ফক্কিকারী আমার কিছু করতে পারবে না" উত্তর দিলো ইগ্‌নোসি। "শোন্ যেখানে এইসব ঝক্‌মকে পাথর আছে সেই স্থানটি আমাদের দেখিয়ে দিতে হবে।"

"হাঃ !—হাঃ !" গাগুল তার সরু-গলায় হেসে উঠলো। আমি ছাড়া কেউ জানে না সে জায়গা! বলবো না,—কোথায় তা বলবো না! সাদাভূতের দলকে এখান থেকে শুধু হাতে ফিরতে হবে।"

"না বললে তোকে তিলে তিলে মরতে হবে, বুঝলি ?"

"মরতে হবে ?" ভয়ে আর রাগে সে চীৎকার করে উঠলো, "খবর্দার আমার গায়ে হাত দিস্ না বলছি—ওঃ সাহস ভারী! জানে না আমি কে ?"

"তুই দেখাবি কিনা ? যদি না দেখাস তবে এখুনি তুই মর্" বলেই, ইগনোসি একটা বর্শা তার দিকে তুলে ধরলো। তারপর আস্তে আস্তে উদ্যত বর্শাটা নামিয়ে নিয়ে এলো সে। বর্শার ফলাটা একটু একটু করে সেই জীবন-পুঁটলীটার গায়ে বিঁধতে লাগলো।

একটা বীভৎস চীৎকার দিয়ে গাগুল লাফিয়ে উঠেই আবার মাটিতে লুটিয়ে পড়লো।

"নাঃ—নাঃ, আমি দেখাবো—দেখাবো। শুধু আমাকে বাঁচতে দে, বাঁচতে দে, ঐ রোদে বসে বসে আরামে একটু কেবল মাংসের টুকরো চুষবো—আর কিছু চাইনে—আর কিছু না।"

"বেশ, তাহলে তুই ইন্‌ফাদুস্ আর আমার এই সাদাভাইদের কাল সেই জায়গা দেখাতে নিয়ে যাবি। যদি না দেখাস তাহলে তিলে তিলে তোকে মরতে হবে বলে দিলাম।"

"ভুলবো না ইগনোসি, ভুলবো না। আমি কথার খেলাপ করি না—হাঃ! হাঃ! হাঃ! অনেকদিন আগে, একবার এক স্ত্রীলোক, এক সাদামানুষকে এমনি করেই সেই কুঠুরী দেখিয়েছিল, কি ঘটেছিল তার? বিপদ! বিপদ! তারও নাম ছিল গাগুল। হয়তো সে গাগুলও আমিই ছিলাম।"

"মিথ্যে কথা।" "আমি বলে উঠলাম, সে আজ দশ-পুরুষ অগেকার ব্যাপার।"

"হয়তো হবে—হয়তো হবে, অনেকদিনের বুড়ী হলে ভুল হয়ে যায়রে—সব ভুল হয়ে যায়। হয়তো মায়ের মা'র কাছে শুনেছি সে কথা। তবে হ্যাঁ, তার নামও ছিল গাগুল। কিন্তু দেখে নিও, সেই জায়গায় যখন যাবে, তখন দেখতে পাবে ঝক্‌ঝকে পাথর ভর্তি একটা চামড়ার থলে পড়ে আছে সেখানে। লোকটা থলে ভরেছিল ঠিকই কিন্তু নিয়ে যেতে পারেনি কিছুতেই। ঐ যে বললাম, বিপদ'—বিপদ ঘটেছিল, তাই! মায়ের মা'র কাছে শুনেছি,—হতেও পারে। হুম্—বেশ ভালোয় ভালোয় যাওয়া যাবে—যুদ্ধে যারা মরেছে তাদের চোখগুলো এতোদিনে শকুনে খুব্‌লে নিয়ে গেছে, পাঁজরাগুলো ফোঁপ্‌রো হয়ে এসেছে। হাঃ! হাঃ! হাঃ!"
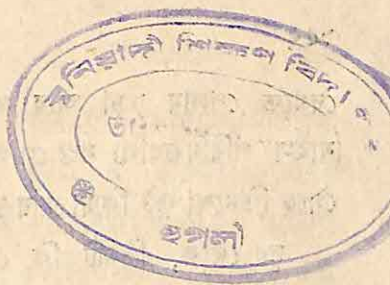
যমপুরী

তিনদিন পরের কথা। সন্ধ্যা গাঢ় হয়ে এসেছে। আমরা 'তিন ডান' নামে ত্রিভুজ আকারে অবস্থিত তিনটি পাহাড়ের পাদদেশে এক কুটীরে বসে আছি। এই পাহাড়ের দিকেই সলোমনের রাজপথ চলে গেছে। আমাদের দলে আমরা তিনজন, আমাদের খাবার-দাবার ব্যবস্থার জন্য ফৌলতা, ইন্‌ফাডুস্, আর গাগুলকে একটা ঝুড়ির মধ্যে বসিয়ে বেহারারা বয়ে নিয়ে এসেছে। এছাড়া আমাদের সঙ্গে আছে কয়েকজন রক্ষী। গাগুল সারাপথ বিড়্ বিড়্ করে বক্‌তে বক্‌তে আর শাপান্ত করতে করতে চলেছে।

পরদিন ভোরবেলাকার সূর্যালোকে সেই তিনপাহাড়ের তিন চূড়ার যে অপরূপ রূপ দেখলাম, তা জীবনে কখনো ভুলবো না। আমাদের সামনে দিয়ে সাদা ফিতের মত সলোমনের রাজপথ সেই দূরে মাঝের পাহাড়টার চূড়ার তলায় উঠে গেছে। আমাদের কাছ থেকে সেখানটা প্রায় পাঁচ মাইল। পথটা সেইখানে গিয়েই শেষ হয়ে গেছে।

প্রায় ঘন্টা দেড়েক ধরে আমরা সেই পথ বেয়ে উঠে চলেছি। উত্তেজনায় এত জোরে যাচ্ছিলাম যে গাগুলের ডুলির বেহারারাও আমাদের সঙ্গে তাল রেখে চলতে বেগ পাচ্ছিল। গাগুল থামার জন্য বার বার চেচাচ্ছিল, কিন্তু আমরা তার কথায় কান না দিয়েই এগিয়ে চলতে লাগলাম। কিছুক্ষণ বাদে চূড়াটা আমাদের চোখে পড়লো।

দেখতে পেলাম চূড়া আর আমাদের মাঝখানে রয়েছে একটা আধ মাইল পরিধিওয়ালা মস্ত গোল গহ্বর—ধারগুলো তার ঢালু হয়ে নেমে গেছে তিনশো ফুট কিম্বা তারও বেশী নিচুতে।

দূর থেকে, তিনটি কি দেখবার জন্য কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে সামনের পথ ধরেই আমরা এগুলাম। যত কাছে যেতে লাগলাম, সেই তিনটি জিনিস বিরাট মূর্তির আকার নিতে লাগলো। আমাদের মনে হতে লাগলো, যেন আমাদের সামনে সেই তিনটি নির্বাক দেবতার মূর্তি বসে আছে, যাদের কথা বলতে কুকুয়ানারা হতবাক হয়ে যায়। কিন্তু একেবারে কাছে না যাওয়া পর্যন্ত সেই নির্বাক দেবতাদের মাহাত্ম্য ঠিক বুঝতে পারলাম না।

কাছে গিয়ে, প্রকাণ্ড কালো কালো পাথরের আসনের ওপর তিনটি বিরাটমূর্তি বসা অবস্থায় আমাদের চোখে পড়লো—দুটি মূর্তি পুরুষের, একটি স্ত্রীলোকের। প্রত্যেকটার মাপ বোধ হয় মাথা থেকে আসন পর্যন্ত আঠারো ফুট।

স্ত্রী মূর্তিটি দেখতে ভারী সুন্দর—তবে অতি প্রাচীন বলে জল-হাওয়ায় তার কিছুটা ক্ষতি হয়েছে। তার মাথার দুধারে চাঁদের ফালি বেরিয়ে আছে। পুরুষ মূর্তিদুটি কিন্তু ঠিক উল্টো রকমের। একেবারে ভীষণ রকমের দেখতে। বিশেষ করে আমাদের বাঁদিকের মূর্তিটাকে তো একেবারে ভূতের মতন লাগছিল। ডান দিকের মূর্তিটার মুখ শান্ত বটে, কিন্তু তার থমথমে ভাব দেখলে ভয় ধরে যায়—সমস্ত মুখে যেন একটা অমানুষিক নিষ্ঠুরতার গম্ভীর চাপা ভাব।

কুকুয়ানাদের এই নির্বাক দেবতাদের দিকে তাকিয়ে এই সব অদ্ভুত মূর্তিগুলির সম্বন্ধে আলোচনায় আমরা মগ্ন হয়ে গেলাম। ইতোমধ্যে ইন্‌ফাদুস্ এগিয়ে এলো। বর্শা তুলে সে এই নির্বাক

দেবতাদের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে আমাদের জিজ্ঞাসা করলো যে, আমরা তখনি গুহাপথে রওনা হবো, না মধ্যাহ্ন ভোজন পর্যন্ত অপেক্ষা করবো। বেলা তখনও এগারোটা হয়নি। কাজেই আমরা ঠিক করলাম যে এখুনি যাত্রা করাই উচিত। পাছে সেই গুহার মধ্যে আমাদের অনেকক্ষণ আট্‌কা থাকতে হয় সেই জন্যে সঙ্গে কিছু খাবার নেওয়াই বিবেচনা করলাম। গাগুলের ডুলি কাছে নিয়ে আসা হলো। বুড়ী এবার একলাই ডুলি থেকে নামলো। ইতোমধ্যে ফৌলতা আমার অনুরোধে একটা বেতের ঝুড়িতে কিছু শুকনো মাংস, জল ভর্তি দুটো লাউএর খোল সংগ্রহ করে নিলো।

আমাদের সামনে থেকে সোজা প্রায় হাতপঞ্চাশেক দূরে, মূর্তিগুলির ঠিক পেছনে, আশীফুট মতন উঁচু একটা দেয়াল উঠে গেছে। দেয়ালটা ক্রমশঃ খাড়াই হয়ে হিমরেখায় এসে মিশে গেছে। তারপরই সুরু হয়েছে তুষার মৌলী পর্বতশৃঙ্গ—মাথার ওপর তিন হাজার ফুট উঁচুতে সোজা উঠে গেছে সেই চুড়া। গাগুল ডুলি থেকে নেমেই আমাদের দিকে বিষদৃষ্টি হানলে, তারপর লাঠির ওপর ভর দিয়ে ন্যাংচাতে ন্যাংচাতে এগিয়ে চলতে লাগলো। আমরা তার অনুসরণ করলাম।

একটা সরু পাথরের ওপর খিলান গাঁথা জায়গায় এসে আমরা থামলাম। জায়গাটা দেখে, খনির মুখে, গ্যালারীর মতন মনে হলো। গাগুল এখানে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। তার হাঁড়ি পানা মুখে তখনও বিষ লেগে রয়েছে।

সরুগলায় সে বলে উঠলো, "ওগো তারার দেশের সাদামানুষেরা, সবাই তৈরী তো? দেখো বাপু, পরে আমায় দুষো না কিন্তু! আমি রাজার আদেশেই তোমাদের ঝক্‌ঝকে পাথরের ঘর দেখাতে এসেছি। হাঃ! হাঃ! হাঃ!" একটা চাপা হাসিতে সে মত্ত হয়ে উঠলো।

"হ্যাঁ আমরা সবাই তৈরী।" আমি জবাব দিলাম।

"বেশ! বেশ! এবার যা দেখবে তার জন্যে এখন থেকেই বুক বাঁধো। ইন্‌ফাদুস্, বিশ্বাস ঘাতক, তুইও আসবি নাকি ?"

ইন্‌ফাদুসের ভুরু কুঁচকে উঠলো। সে জবাব দিলো, "না, আমি যাবো না। কারণ আমার ওখানে যাওয়া উচিত নয়। কিন্তু মুখ সামলে কথা বলবি গাগুল। আর এঁদের সঙ্গে ঠিক-ঠিক কাজ করবি। তোর হাতে এঁদের সঁপে দিচ্ছি। এঁদের একগাছি কেশও যদি কেউ স্পর্শ করে, তবে তোর নিস্তার নেই, বুঝলি ?"

"বুঝলাম রে ইন্‌ফাদুস্, বুঝলাম ; জানি তুই চিরকাল খালি বড় বড় বুকনি কাটিস। কিন্তু ভয় নেই রে, ভয় নেই। আমি বিরাট কাল রাজার আদেশ পালন করার জন্যেই বেঁচে আছি। হাঃ! হাঃ! আবার সেই রাজাদের মুখ দেখতে চলেছি আমি। তওয়ালার মুখও আবার দেখবো! চলে আয়, চলে আয়। আছে আছে, সঙ্গে আমার বাতি আছে।" এই কথা বলে গাগুল তার চাদরের তলা থেকে পল্‌তে লাগানো একটা তেল ভর্তি লাউয়ের খোল বের করে অবিচলিত ভাবে গুহার মুখে ঢুকে পড়লো।

গুহার মুখে রাস্তা খুব চওড়া ছিল না। সে পথে দুটো লোক পাশাপাশি কোন রকমে সোজা হয়ে চলতে পারে। গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন পথে আমরা তার গলার আওয়াজ শুনে শুনে এগুতে লাগলাম। ভয়ে গা ছম্ ছম্ করতে লাগলো।

"আরে!" গুড্ চীৎকার করে উঠলো, "কে যেন আমার মুখে মারলো।"

"বাদুড়।" আমি জবাব দিলাম, "এগিয়ে চল।"

যতদূর মনে হয় হাত-পঞ্চাশেক যাবার পর পথটায় ক্ষীণ আলোর

রেখা দেখা যেতে লাগলো। কয়েক মিনিটের মধ্যে আমরা এমন এক জায়গায় এসে উপস্থিত হলাম যা জীবন্ত মানুষের পক্ষে দেখা অসম্ভব।

মনে হলো একটা বিশাল গির্জার অভ্যন্তরে আমরা দাঁড়িয়ে আছি—তার কোথাও জানালা নেই, শুধু মাথার ওপর দিকে একটা ক্ষীণ আলোর রেখা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। হয়তো ছাদের দিক দিয়ে বাইরের সঙ্গে তার কোন রকম যোগাযোগ থেকে থাকবে। সেই গির্জার ছাদ খিলানের আকারে আমাদের মাথার ওপর একশো ফুট উচুঁতে উঠে গেছে। মানুষের তৈরী গির্জার চেয়ে প্রকৃতির গড়া এই গির্জা বিরাট লাগতে লাগলো। কিন্তু শুধু বিরাটত্বেই এর বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাচ্ছিল না। কারণ সেই প্রকাণ্ড ঘর জুড়ে সারি সারি বরফের সাদা সাদা অসংখ্য থাম ছাদের তলা থেকে নেমে এসেছে দেখলাম। থামগুলি বরফের মতন দেখতে হলেও আসলে সেগুলি ছিল চুনা পাথরের তৈরী। অসংখ্য শ্বেতস্তম্ভের সেই অদ্ভূত মনোহারী সৌন্দর্যের বর্ণনা দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব।

প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সুন্দর স্তম্ভগুলির কোনটা অপূর্ব সৌন্দর্য ছড়াতে ছড়াতে সোজা ছাদে গিয়ে ঠেকেছে, কোনটা বা অৰ্দ্ধ পথেই শেষ হয়ে গেছে। চোখ তুললে, মাথার ওপর অস্পষ্ট জমাট বড় বড় ঝালর চিক্ চিক্ করে ওঠে। সেই সব বরফের ঝালর থেকে নীচে থামের ওপর টপ্ টপ্ করে জল ঝরে পড়ছে।

সেইখানে দাঁড়িয়ে থাকতেই বিশ্বকর্মার কর্মশালার শব্দ আমাদের কানে আসতে লাগলো। বুঝলাম যে, মাথার ওপর ঐ জমাট বরফের ঝালরগুলোর থেকে মাঝে মাঝে টপ্ টপ্ করে ফোঁটায় ফোঁটায় জল নীচে থামের ওপর ঝরে পড়ছে। এমনি ভাবে জলের ফোঁটা পড়ে

একটা দশ ফুট গোল আর আশী ফুট স্তম্ভ জমাট বাঁধতে যে কত সময় লাগবে তা ভেবে অবাক হয়ে গেলাম।

অমন আশ্চর্য সুন্দর গুহাটি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখবার ইচ্ছা থাকলেও গাগুলের জন্য তা সম্ভব হয়ে উঠলো না। কারণ, এই সব থামের ওপর তার একটুও দৃষ্টি ছিল না। কোন রকমে আপন কাজ শেষ করে ফেলেই সে যেন বাঁচে, এমনি হয়ে উঠেছিল তার অবস্থা। যা হোক তখনকার মত মনের বাসনা মনে মনে চেপে গিয়ে সেই ডাইনী গাইড্‌কে অনুসরণ করলাম। ঠিক করলাম যে, ফিরতি পথে গুহাটা আমরা তন্ন তন্ন করে দেখে যাবো।

সেই নিস্তব্ধ, বিশাল গুহার সামনের দিকে সে সোজা আমাদের নিয়ে চললো। চল্‌তে চল্‌তে একটা দরজার কাছে এসে পৌঁছুলাম। দরজার খিলানটা ধনুকের মতন বাঁকা লাগলো না, বরং ওপর দিকে মিশরীয় মন্দিরের মতন চৌ-কোনা লাগলো।

খট্‌ খট্‌ করে লাঠি ঠুকতে ঠুকতে গাগুল সেই পথ ধরে চল্‌তে লাগলো। চলার সময় একটা ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর চাপা হাসি তার মুখ থেকে বেরিয়ে এলো। একটা অজানা বিপদের আশঙ্কায় আমি পিছিয়ে এলাম।

"চলুন মশাই চলুন," গুড্‌ বলে উঠলো, "তা নইলে আমাদের এমন গাইডটিকে হারিয়ে ফেলবো যে।"

গুডের আগ্রহাতিশয্য আর অনুরোধে আমি পথ ধরে এগিয়ে চললাম। প্রায় বিশ পা মতন গিয়ে চল্লিশ ফুট লম্বা, তিরিশ ফুট উঁচু একটা অন্ধকার ঘরে এসে উপস্থিত হলাম। মনে হলো, সুদূর অতীতে শ্রমিকরা পাথর কেটে কেটে এই ঘরটা তৈরী করেছে। ঘরটা

পাশের সেই বিশাল চূণা পাথরের গুহার মতন অতখানি আলোকিত বলে বোধ হলো না। প্রথম দৃষ্টিতে আমার চোখে পড়লো ঘরজোড়া মস্ত এক পাথরের টেবিল—তার মাথার দিকে রয়েছে বিরাট এক সাদা মুর্তি আর চারপাশে মানুষ-সমান সব ছোট ছোট পুতুল। টেবিলের ওপর মাঝখানে একটা বাদামী রঙের বস্তুকে বসা অবস্থায় আমার চোখে পড়লো সেটা যে কি বস্তু সেই স্বল্পালোকে তা প্রথমে ঠিক করতে পারলাম না কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই সেই স্বল্পালোকে আমার চোখ অভ্যস্ত হয়ে উঠলো। আর অভ্যস্ত হবার সঙ্গে সঙ্গেই আমি প্রাণ পণ শক্তিতে সেখান থেকে দৌড় মারলাম।

স্যার হেনরী যদি সেই সময় আমার কলার চেপে না ধরতেন, তাহলে আমার বিশ্বাস যে, আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যে সেই থামওয়ালা চূণা পাথরের গুহা ছেড়ে নিশ্চয় চলে আসতাম। এমন কি কিম্বার্লীর সমস্ত হীরা পাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েও আমাকে সেই গুহার অভ্যন্তরে আর কেউ পাঠাতে পারতো না। কিন্তু তিনি আমাকে এতো জোরে ধরে ছিলেন যে আমার পালাবার কোন উপায়ই ছিল না। যা হোক পর মুহূর্তেই আলোর দিকে তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো এবং আমাকে তিনি ছেড়ে দিয়ে কপালের ঘাম মুছতে লাগলেন। গুড্ অস্ফুটভাবে ভগবানের নাম করে উঠলো। ফৌলতা ভয়ার্ত চীৎকার করে উঠলো। কেবল মাত্র গাগুল খিক্ খিক্ করে দীর্ঘ চাপা হাসিতে মত্ত হয়ে উঠলো।

সে এক ভয়ানক দৃশ্য। দেখলাম টেবিলের শেষ প্রান্তে প্রায় পনেরো ফুট বা তারও বেশী উঁচু এক কঙ্কালের মূর্তিতে যমরাজ স্বয়ং বসে আছেন। আর তাঁর হাতের কঙ্কালসার আঙ্গুলের ফাঁকে শোভা পাচ্ছে এক বর্শা।

এই মূর্তি দেখে আমার মুখ দিয়ে অস্পষ্ট ভাবে বেরিয়ে এলো, "আরে বাপ্‌স্! এটা কি?"

টেবিলের চারপাশের সাদা মূর্তিগুলির দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে গুড্ প্রশ্ন করে উঠলো, "আর ঐ বস্তুগুলিই বা কি?"

স্যার হেনরী টেবিলের ওপর বসা বাদামী প্রাণীটাকে লক্ষ্য করে বলে উঠলেন, "দুনিয়ার মধ্যে ওটা আবার কোন আজব চীজ?"

"হিঃ! হিঃ হিঃ!" গাগুল হেসে উঠলো, "মরণ পুরীতে ঢুকলে লোকের অমঙ্গলই হয়। হিঃ! হিঃ! হিঃ! হাঃ হাঃ!

"আয় ইন্‌কুবু, দেখবি আয়, যুদ্ধে যাকে তুই হত্যা করেছিস তাকে দেখবি আয়।" এই কথা বলে বুড়ী তার লিক্‌লিকে আঙ্গুল দিয়ে স্যার হেনরীর কোট ধরে টেবিলের দিকে টানতে টানতে নিয়ে গেলো। আমরাও তার অনুসরণ করলাম।

খানিকটা গিয়ে দাঁড়িয়ে সে বাদামী জিনিসটার দিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখালো। স্যার হেনরী সেই দিকে তাকিয়ে এক বিস্ময় সূচক আওয়াজ করে পিছিয়ে এলেন। এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই, কারণ সভয়ে দেখতে পেলাম, কুকুয়ানাদের শেষ রাজা তওয়ালার শুকনো নগ্ন লাশটা হাঁটুর উপর ভর দিয়ে টেবিলের মাঝখানে পড়ে রয়েছে। মরা দেহের ওপর কাঁচের মতন একটা পর্দা জমাতে তার সমস্ত রূপটা আরো ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। শরীরের ওপর এই স্বচ্ছ পর্দা জমার হেতুটা প্রথমে আমরা বুঝে উঠতে পারলাম না। কিন্তু পরক্ষণেই দেখতে পেলাম যে, সেই ঘরের ছাদ থেকে ক্রমান্বয়ে টিপ্-টিপ্-টিপ্ করে অবিরাম জলধারা সেই লাশের ঘাড়ের ওপর প'ড়ে সমস্ত দেহের ওপর দিয়ে বয়ে গিয়ে, অবশেষে টেবিলের ওপর একটি ছোট্ট ফুটোর মধ্য দিয়ে তা বেরিয়ে এসে পাথরের ফাটলে মিশিয়ে যাচ্ছে। এতক্ষণে এই স্বচ্ছ পদার্থ

সম্বন্ধে আমি কিছুটা আন্দাজ করতে পারলাম—বুঝলাম তওয়ালার দেহ ধীরে ধীরে চূনা পাথরে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে।

টেবিলের চারপাশে পাথরের বেঞ্চিতে বসা সাদা মূর্তিগুলোর দিকে দৃষ্টিপাত করাতে আমাদের এ ধারণা আরো বদ্ধমূল হয়ে উঠলো। মূর্তিগুলো মানুষের বলেই মনে হলো। অন্ততঃ এককালে মানুষের ছিল, কিন্তু এখন চূনা পাথরে পরিবর্তিত হয়ে গেছে। এমনি ভাবেই স্মরণাতীত কাল থেকে কুকুয়ানারা তাদের মৃত রাজাদের দেহ কালের হাত থেকে রক্ষা করে এসেছে। দীর্ঘকাল এই জলধারার নীচে দেহগুলি বসিয়ে রাখা ছাড়া আর কোনও উপায়ে তারা এগুলি রক্ষা করতে পারতো কিনা তা আবিষ্কার করতে পারিনি বটে, কিন্তু আমাদের চোখের সামনে সেগুলিকে দেখলাম জমাট তুষারাবৃত। সেই বালুকাত্মক জলধারায় তারা অনন্ত কালের স্থায়িত্ব লাভ করেছে।

সলোমনের ধনভাণ্ডার

মৃত্যুপুরীর ভয়াল সৌন্দর্য দেখতে দেখতে যখন আমরা কতক পরিমাণে ভয় কাটিয়ে উঠছিলাম, গাগুল তখন অন্য কাজে ব্যস্ত ছিল। আমাদের চোখ পড়তে দেখতে পেলাম যে, সে কেমন করে যেন হামা দিয়ে টেবিলের ওপর উঠে আমাদের মৃত বন্ধু তওয়ালার দিকে চলেছে। গুড্ মন্তব্য করলো যে, ও বোধ হয় তওয়ালার অবস্থাটা দেখতে যাচ্ছে কিম্বা নিজের কোন কুমতলব শান দিচ্ছে। একটু বাদেই সে থপ্-থপ্ করে পিছু হটে এসে টেবিলের চারধারে বসা সেই প্রস্তর মূর্তিগুলোকে অতি পরিচিতের মতন সম্বোধন করতে লাগলো। তারপর টেবিলের উপরই মৃত্যু-দেবতার শ্বেত মূর্তির নীচে উবু হয়ে বসে সে প্রার্থনা করতে বসলো।

"গাগুল—," আমি খুব আস্তে বললাম, কারণ সে জায়গায় ফিস্‌ফিস্ করে ছাড়া, বেশী জোরে কথা বলতে কারুর সাহস ছিল না,

"আমাদের রত্নকক্ষে নিয়ে চলো।"

প্রাচীন জীবটি তক্ষুনি হিঁচড়ে হিঁচড়ে টেবিল থেকে নেমে পড়লো।

"হুজুরদের ভয় লাগছে না তো?" আমার মুখের উপরই সে প্রশ্ন করে বসলো।

"পথ দেখাও।" উত্তর করলাম।

"বেশ—বেশ!" বলে সে লাফাতে লাফাতে মৃত্যু দেবতার মূর্তির পিছন দিকে গেলো।—"হুজুর, এই সেই ঘর; এবার আলো জ্বালিয়ে

ঢুকুন!" এই বলে সে তেলভরা লাউয়ের খোলটা নামিয়ে গুহার দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়ালো। আমার কাছে দেশলাইয়ের যে কটা কাঠি ছিল তারই একটা ধরিয়ে ঘাসের পল্‌তেটা জ্বালালাম, কিন্তু চোখের সামনে শক্ত পাথরের দেয়াল ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়লো না। গাগুল দাঁত ভেংচে বলে উঠলো, "হুজুর ঐখানেই পথ পাবেন। হাঃ! হাঃ! হাঃ!"

আমি ধমক দিয়ে বলে উঠলাম, "তামাসা রাখো।"

"হুজুর, তামাসা নয়,—ঐ দেখুন!" সে দেয়ালের দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে দিলো।

আলো তুলে সে যখন জায়গাটা দেখিয়ে দিলো, তখন আমরা বুঝতে পারলাম যে, মেঝে থেকে একটি বিশাল প্রস্তরখণ্ড ধীরে ধীরে উপরের দিকে উঠে পাথরের দেয়ালের সঙ্গে এক খাঁজের মধ্যে মিশিয়ে যাচ্ছে পাথরটা আকারে বেশ বড়-সড় একটা দরজার মতন লাগলো—প্রায় দু'শফুট চওড়া আর কমপক্ষে পাঁচ ফুট মোটা; ওজন অন্তত পক্ষে তার হবে বিশ থেকে তিরিশ টনের মতন।

অতি ধীরে ধীরে সুবিশাল প্রস্তরটা আপনা আপনি উঠতে উঠতে অবশেষে মিলিয়ে গেলো। আর সামনে আবার একটা অন্ধকারাচ্ছন্ন গুহার অস্তিত্ব দেখা দিলো।

"ওগো তারার দেশের সাদামানুষেরা, এবার ঢোকো," গাগুল দরজার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বললো, "কিন্তু হ্যাঁ, ঢোকার আগে তোমরা দাসী গাগুলের কথাটা শোন। এই গুহার মধ্যে যে, ঝক্‌ঝকে পাথরগুলো দেখতে পাবে, সেগুলো খুঁড়ে খুঁড়ে তোলা হয়েছিল ঐ যে-গভীর গর্তের ওপর নির্বাক দেবতারা বসে আছেন, তারই ভিতর থেকে। এই ঘরে এনে ওগুলো কে রেখেছিল তা আমি অবিশ্যি বলতে

পারি না। তবে মনে হয় যারা এখানে রেখেছিল, তারা পাথরগুলো কোন রকমে ঘরে বোঝাই করেই, সাত তাড়াতাড়ি পালিয়ে বেঁচেছিল। এই পাথরের কথা যুগ যুগ ধরে লোকের মুখে মুখে দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল, কিন্তু এখানে প্রবেশ করার পথও কেউ চিনতো না বা গুপ্ত দরজার কথাও কেউ জানতো না। অবশেষে পাহাড়ের ওপর থেকে এক সাদামানুষ এদেশে আসে, সেও হয়তো তারার দেশ থেকেই এসেছিল। তখনকার রাজা তাকে সাদর অভ্যর্থনাই জানিয়েছিল। ঘটনাচক্রে সে আর এই দেশের এক মেয়ে এই জায়গায় এসে পোঁছোয়। দৈবক্রমে সেই মেয়েটি এই গুপ্তদরজার কথা জানতো। তারই সাহায্যে সেই মানুষটি এই কক্ষে প্রবেশ করে গুপ্ত-রত্নের সন্ধান পায়। মেয়েটির কাছে খাবার রাখবার জন্যে একটা ভেড়ার চামড়ার থলে ছিল। লোকটা থলেটা চেয়ে নিয়ে তাতে ঐ পাথর গুলো বোঝাই করে নেয়। বোঝাই করে ঘর থেকে বেরোবার সময় সে আর একটা শেষ পাথর তুলে নেয়—বেশ বড় পাথর। হাতে নিয়ে সেটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে থাকে—"এইখানে গাগুল থামলো।

"তারপর ?', আমি জিজ্ঞাসা করলাম। কৌতূহলে আমার মতনই সবায়ের নিঃশ্বাস রুদ্ধ হয়ে উঠেছিল। "তারপর ডা সিল্‌ভেস্ত্রের কি হলো ?"

সেই খুন্‌খুনে বুড়ী নামটা শোনা মাত্র চম্‌কে উঠলো।

"মরা মানুষটার নাম তোরা কি করে জানলি ?" সে ফস্ করে প্রশ্ন করে বসলো; তারপর উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করেই আবার বলতে সুরু করলো, "কি যে হলো তারপর তা কেউ জানে না; তবে ব্যাপার দেখে মনে হলো সাদামানুষটা ভয় পেয়ে গেছে। থলে ভর্তি পাথর ফেলে দিয়ে, খালি বড় পাথরটা হাতে করে সে এখান থেকে

ছুটে বেরিয়ে এলো। সে-পাথরটাও লোকটা নিয়ে যেতে পারে নি। রাজা সেটা কেড়ে নিয়েছিল। মাকুমাজাহন্, তওয়ালার কপাল থেকে তুমি যে পাথরটা খুলে নিয়েছিলে সেটা ঐ পাথর।"

আমি সেই অন্ধকার ভরা পথের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলাম, "তারপর থেকে কেউ এখানে প্রবেশ করেনি ?"

"আজ্ঞে না হুজুর। দরজার গোপন রহস্য কাউকে বলা হয় না। শুধু নতুন রাজারা এসে এটা একবার খোলে, কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করে না। প্রবাদ আছে, এর মধ্যে ঢুকলে এক চাঁদের মধ্যেই মরতে হবে। এমনকি সেই সাদামানুষটাও মরে ছিল—পাহাড়ের ওপর এক গুহার মধ্যে—মাকুমাজাহন্ তাকে তোমরা তো দেখেছো, কাজেই রাজারা এখানে প্রবেশ করে না। হাঃ! হাঃ! হাঃ সত্যি, আমার কথা সব সত্যি !"

কথা বলার সময় ওর দৃষ্টির সঙ্গে দৃষ্টির বিনিময় হওয়ায় আমি অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। নিরুৎসাহে আমার মন ভরে উঠলো।

"এবারে হুজুরদের প্রবেশ করা হোক! আমার কথা যদি সত্যি হয়ে থাকে তো ঘরের মেঝেতে ভেড়ার চামড়ার থলে আর পাথর নজরে পড়বে ; আর—আর এখানে ঢুকলে মানুষ মরে কি না তার প্রমাণ পরেই পাবেন। হাঃ! হাঃ! হাঃ!"

আলোটা হাতে নিয়ে অন্ধকার কক্ষপথে সে থপ্ থপ্ করে এগিয়ে চললো। তাকে অনুসরণ করতে আমি ইতস্তত করতে লাগলাম।

"যত সব বুজরুকি!" গুড্ বলে উঠলো, ঐ পেত্নী বুড়ীর কথায় আমি ভয় পাই না।" এই বলে সে গাগুলের পিছনে পিছনে কক্ষের পথে পা বাড়ালো। ফৌলতাও তার পিছু নিলো। কিন্তু ভয়ে তার ঠক্-ঠকানি দেখে স্পষ্টই বুঝতে পারলাম যে, আদবেই তার

এসব ভালো লাগছে না। আমরাও তাড়াতাড়ি তাদের অনুসরণ করলাম।

পাথর থেকে কাটা একটা সরু গলি-পথ গুহার দিকে চলে গেছে। তারই মধ্যে কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে গাগুল আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছিল।

পথের দু'ধারে গ্রেনাইট্ পাথরের বড় বড় টুকরো, পাথর জোড়া দেবার মশ্‌লা আর আধুনিক ধরণের যন্ত্রপাতি আমাদের নজরে পড়লো। মনে হলো দেয়াল তোলার জন্যে যেন সেখানে ওগুলো সাজিয়ে রাখা হয়েছে।

এইখানে এসে ফৌলতার অবস্থা ভয়ে ও দুশ্চিন্তায় এমন হয়ে উঠলো যে, সে আর চলতে পারে না—মূর্চ্ছা যায়-যায়। কাজেই বিশ্রামের জন্য আমরা সেই অসমাপ্ত দেয়ালের কাছে তাকে খাবারের ঝুড়ি দিয়ে বসিয়ে রেখে এগিয়ে চললাম।

প্রায় পনেরো কদম এগিয়ে গিয়ে হঠাৎ আমরা একটা বিচিত্র রঙ করা দরজার সামনে এসে পড়লাম। দরজাটা একেবারে হাট করে খোলা। শেষ বারের মতন যে ঢুকেছিল সে বোধ হয় দরজাটা বন্ধ করার সময় পায়নি বা দরজা বন্ধ করার কথা ভুলেই গিয়েছিল।

দরজার কাছে একটা ভেড়ার চামড়ার থলে নজরে পড়লো। মনে হলো সেটা নুড়ি-টুড়িতে ভর্তি।

গুড্ কুড়িয়ে নেবার জন্যে নীচু হলো। ভারী থলেটা ঝম্ ঝম্ করে উঠলো।

"আরি ব্যস্! মনে হচ্ছে থলেটা হীরেতে ভর্তি।" অবাক হয়ে ফিস্ ফিস্ করে সে কথাগুলো বলে উঠলো। ছোট হলেও থলে ভর্তি হীরে—ভাবতেই সবার আশ্চর্য লাগে না কি?

"এগিয়ে চলুন" স্যার হেনরী উদ্বিগ্ন হয়ে বলে উঠলেন, "ওগো বুড়ী, তুমি বাছা আমার হাতে আলোটা দাও।" আলোটা গাগুলের হাত থেকে নিয়ে চৌকাঠ পেরিয়ে তিনি সেটা মাথার ওপর তুলে ধরলেন।

আমরাও তক্ষুনি তাঁর অনুসরণ করলাম। সেই মুহূর্তের জন্যে থলে ভর্তি হীরের কথা ভুলে গিয়ে সলোমনের খাস্ ধন-ভাণ্ডারে পা দিলাম।

প্রদীপের ক্ষীণ আলোতে সর্ব প্রথম আমাদের চোখে পড়লো যে আমরা একটা পাহাড়-কাটা চৌখুপী ঘরে দাঁড়িয়ে আছি। ঘরটা দশ ফুটের মতন চওড়া, লম্বায়ও প্রায় সেই রকমই। তারপর দেখতে পেলাম, মেঝে থেকে ছাদের খিলান পর্যন্ত রাশ রাশ অপূর্ব সব হাতীর দাঁতের সংগ্রহ—একটার পর একটা থরে থরে সাজানো। সে যে কতো তা আমরা কেউ আন্দাজ করতে পারলাম না। তবে মনে হলো, শুধু এই সম্পদই এক জীবনের পক্ষে যথেষ্ঠ। ভাবলাম, হয়তো সলোমন তাঁর অতুলনীয় হাতীর দাঁতের সিংহাসণের উপাদান এখান থেকেই সংগ্রহ করেছিলেন।

বিপরীত দিকে গোটা কুড়ি কাঠের বাক্স দেখতে পেলাম। বাক্সগুলি দেখতে গোলা-বারুদ রাখার মতনই সাধারণ বাক্স—তবে তার থেকে লম্বায় বড়, আর লাল রঙ করা।

"আলো নিয়ে আসুন, ওখানেই হীরে-জহরৎ আছে", আমি চীৎকার করে উঠলাম।

স্যার হেনরী আলো নিয়ে এগিয়ে এসে বাক্সর ঢাক্‌নার ওপর ধরলেন। কালের প্রভাবে এমন শুকনো জায়গাতেও ডালাগুলো জরাজীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। জায়গায় জায়গায় চূর্ণ-বিচূর্ণ মনে হলো—বোধ হয় ত্যা সিল্‌ভেস্ত্রের কাজ। আমি একটা ডালার ফুটোর মধ্যে হাত

ভরে দিয়ে এক মুঠো কি যেন তুলে নিয়ে এলাম—খুলে দেখি হীরে নয়—সব সোনার টুক্‌রো, অদ্ভুত তার আকৃতি। এরকম আমরা এর আগে কেউ কোনদিন দেখিনি, টুক্‌রোগুলোর ওপর হিব্রু অক্ষরের মতন সব ছাপ।

"যাক্!" আমি মুদ্রাগুলো রেখে দিতে দিতে বললাম, "একেবারে খালি হাতে ফিরতে হবে না। এসব আমাদের। আঠারোটা বাক্স তো আছেই আর প্রত্যেকটায় কমসে-কম দু'হাজার করে চাক্‌তি মিলবেই। আমার বোধ হয়, বুঝলেন, মজুর আর ব্যবসায়ীদের এই সব টাকাই দেওয়া হতো।"

গুড্ বলে উঠলো, "আমার মনে হচ্ছে, মাল যা আছে এই। বুড়ো পর্তুগীজের থলের হীরে ছাড়া, অন্য কোন হীরের নাম গন্ধ ও তো দেখছি না।"

"সামনে যে দিক্‌পানে অন্ধকার ঘুরঘুট্টি হয়ে রয়েছে, সেদিক্ পানে হুজুররা এগিয়ে গিয়ে দেখুনতো, পাথর-টাথর মেলে কি না"—গাগুল আমাদের চোখের ভাষা পড়ে উত্তর করলো, "সে দিক্‌পানে এক কোণায় তিনটে সিন্দুক আছে, দুটো মোহর আঁটা, বন্ধ, আরেকটা খোলা।"

"ঐ দিক্‌টা দেখুন মিঃ কার্টিস," আমি গাগুলের নির্দেশ মতন কোণটা দেখিয়ে বলে উঠলাম।

"আরে, এই যে," তিনি চীৎকার করে উঠলেন, "এখানে একটা কুলুঙ্গী! জয় ভগবান! শীগ্‌গির।"

আমরা স্যার হেনরীর দিকে তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলাম। একটা বাঁকানো ধনুকের মতন জানালাওয়ালা কোণে তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন। কুলুঙ্গীর দেয়ালে তিনটে পাথরের সিন্দুক দেখতে পেলাম। প্রত্যেকটা

লম্বা-চওড়ায় দুই বর্গফুটের মতন মনে হলো। দুটো সিন্দুকের পাথরের ডালা বন্ধ ; তৃতীয়টা খোলা পড়ে রয়েছে।

"দেখুন—দেখুন!" স্যার হেনরী সিন্দুকের ওপর আলোটা তুলে ধরে, ধরা গলায় বলে উঠলেন। আমরাও সেদিকে তাকালাম, কিন্তু কয়েক মুহূর্ত কিছুই নজরে পড়লো না। কারণ একটা তীব্র রূপালী ঝলকে আমাদের চোখে ধাঁধা লেগে গেলো। একটু অভ্যস্ত হবার পর দেখতে পেলাম যে, সিন্দুকটার তিন ভাগ আকাটা হীরেতে ভর্তি, প্রত্যেকটাই আকারে বেশ বড়-সড়। একটু নীচু হয়ে কয়েকটা তুলে নিলাম। হ্যাঁ, হীরে ; কোন ভুল নেই। আমার সমস্ত হাত তাদের তৈলাক্ত মসৃন পরশে ভরে উঠলো। হাত থেকে সেগুলো সিন্দুকে ফেলার সময় আমি রীতিমত হাঁফাতে লাগলাম।

"বড়লোক—বড়লোক! সারা দুনিয়ার সব সেরা বড়লোক আমরা!" আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, "মন্টিক্রিষ্ট'? ফুঃ! আমাদের কাছে, তুচ্ছ—তুচ্ছ!"

"হ্যাঁ হীরে দিয়ে আমরা বাজার ভাসিয়ে দেবো।" গুড্ বলে উঠলো।

"হুঁ, আগে সেখানে এগুলো নিয়ে যেতে হবে, তবে সে সব কথা।" স্যার হেনরী মন্তব্য করলেন।

"হিঃ! হিঃ! হিঃ!" গাগুল আমাদের পিছনে খ্যাক্ খ্যাক্ করে হেসে উঠলো।

"এই তো, মিলেছেতো তোদের মনের মতন জিনিস ; নে—নিয়ে যা, যত ইচ্ছে নিয়ে যা। ছড়া, যেমন পারিস, চিবিয়ে খা, গিলে খা যত পারিস—হিঃ! হিঃ! হাঃ! হাঃ!"

হীরে খাওয়ার কথায় সেই মুহূর্তে আমার মনে এমন একটা হাসির

ভাব এলো যে আমিও 'হাঃ—হাঃ' করে হেসে উঠলাম। আমার দেখাদেখি কেন জানি না সকলেই বুকফাটা উচ্চ হাসিতে মেতে উঠলো।

হঠাৎ ভাবটা কেটে যেতে আমরা সবাই থামলাম।

"ওগো, সাদামানুষেরা অন্য সিন্ধুকগুলোও খোলো", গাগুল ব্যাঙের মতন গ্যাঁক্ গ্যাঁক্ করে উঠলো, "ওর মধ্যে নিশ্চয়ই আরো আছে। যত খুশী নাও—যত খুশী নাও! হাঃ! হাঃ! প্রাণ ভরে নাও!"

তার কথাতেই কতকটা যেন উৎসাহিত হয়ে আমরা অপর দুটো সিন্ধুকের ঢাক্না খুলতে বসলাম। মন বলতে লাগলো যে আমরা যেন একটা অধর্ম করছি; কিন্তু অচিরেই শীলমোহর ভেঙে ডালা খুলে ফেললাম।

হুররে! ভর্তি। দুটো সিন্ধুকই একেবারে কানায় কানায় ভর্তি! তৃতীয়টা না হোক দ্বিতীয়টা তো বটেই। কোনও ব্যাটা হ্যা সিল্‌ভেস্ত্রেকেই আর এ দুটো ভেঙে থলে ভর্তি করতে হয়নি। তৃতীয় সিন্ধুকটাতে হীরে কিছু কম থাকলেও—সব একেবারে বাছাই করা সেরা চীজ বলে মনে হলো। ওজনে কোনটাই বিশ ক্যারেটের কম নয়। কোন কোনটা আবার ইয়া বড় বড়, পায়রার ডিমের মতন।

আমরা এতক্ষণ একটা জিনিস লক্ষ্য করিনি; সেটা হলো গাগুলের চোখে মুখে ভয়াল প্রতিহিংসার ছাপ। সে ধন-ভাণ্ডার থেকে বেরিয়ে গলি-পথ দিয়ে নীরেট পাথরের দরজার দিকে একটা সাপের মতই নিঃশব্দে গুঁড়ি মেরে চলে গেলো। তার সমস্ত অনুগ্রহের পিছনে যে দুরভিসন্ধি ছিল, তা লক্ষ্য করতে আমরা ভুলে গেলাম। হঠাৎ চীৎকারের পর চীৎকার, সরু সুড়ঙ্গ পথে কাঁপতে কাঁপতে ভেসে আসতে লাগলো। মনে হলো ফৌলতার গলার আওয়াজ।

"বাঁচাও! বাঁচাও! ও বাউগওয়ান পাথর পড়ছে! পাথর পড়ছে!"

"ছাড় বেটী! তবে—"

"বাঁচাও! বাঁচাও! খুন করলে, খুন!"

আমরা সরু পথ ধরে ছুট দিলাম। কাছে এসে প্রদীপের আলোতে দেখতে পেলাম, গুহার নীরেট-পাথরের দরজাটা অতি ধীরে ধীরে নীচের দিকে নেমে আসছে—মেঝো থেকে তিন ফুট ওপরেও বোধ হয় আর নেই। এরই কাছে ফৌলতা আর গাগুল ঝটাপটি করছে। ফৌলতার বুকে গাগুল মস্ত এক ছোরা বসিয়ে দিয়েছে। বুক থেকে হাঁটু পর্যন্ত কালো রক্তে ভেসে গেছে তার, তবু বুড়ী ডাইনীটাকে দু'হাতে ধরে আছে সে, ছাড়ছে না কিছুতেই! বুড়ীটা কিন্তু বন্য বিড়ালীর-মতন খালি কামড়া-কামড়ি করছে। ইস্! ফৌলতা পড়ে গেলো; গাগুল নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে—ঐ পড়ন্ত দরজার ফাঁক দিয়ে সাপের মতই পিছ্‌লে বেরিয়ে যাবার জন্যে মেঝের ওপর শুয়ে পড়লো। নীরেট পাথরের পড়ন্ত দরজার তলা দিয়ে সে গলছে।—আঃ! ভগবান! দেরী হয়ে গেছে, বড্ড দেরী হয়ে গেছে!

পাথরটা তাকে সাঁড়াশীর মতন চিপ্টে ধরলো, আর অসহ্য যন্ত্রণায় গাগুল চীৎকার করতে লাগলো। ধীরে, অতি ধীরে সেই তিরিশ টনের পাথরের দরজা গাগুলের দেহকে যাঁতার মতন গ্রেনাইট পাথরের মেঝোতে পিষে ফেলতে লাগলো। ওঃ! সে কী মর্মভেদী চীৎকার! জীবনে কখনও অমন শুনিনি। মুড়্ মুড়্ করে একটানা একটা বিশ্রী শব্দ কানে এলো। আমাদের শরীরের মধ্যে কেমন শির্ শির্ করে উঠলো। তারপর সব শেষ। দরজা আগের মতন আবার বন্ধ হয়ে গেলো। আমরা দৌড়ে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে দরজার ওপর পড়লাম। কিন্তু বৃথাই! চার সেকেণ্ড আগেই সব খতম হয়ে গেছে।

ফৌলতার দিকে লক্ষ্য করে বুঝলাম বেচারা আর বাঁচবে না। ছোরাটা তার মোক্ষম জায়গায় বসে গেছে। হলোও তাই। অল্পক্ষণের মধ্যেই সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলো।

বেচারা গুডের চোখ দিয়ে সেবাপরায়ণা মেয়েটির জন্য অঝোর ধারায় জল গড়িয়ে পড়তে লাগলো। রুদ্ধ কান্নায় তার ধরা গলা থেকে আওয়াজ বেরিয়ে এলো, "নেই—ও—নেই।"

স্যার হেনরী ধীর অথচ গম্ভীর ভাবে মন্তব্য করলেন, "হ্যাঁ, আমাদেরও এইবার জীবন্ত, সমাধি হবে বলে মনে হচ্ছে।"

স্যার হেনরীর কথা শুনে এই প্রথম আমি সমস্ত ব্যাপারটার ভীষণতা উপলব্ধি করলাম। ফৌলতার মৃত্যুতে এতো অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম যে, এ সব কথা আমার কিছুই মনে হয় নি, কিন্তু এখন সবটা হৃদয়ঙ্গম করলাম। বিশাল পাথরের দরজা চিরকালের মতনই একরকম বন্ধ হয়ে গেছে। এর গোপন রহস্য যার মাথায় ছিল সে মাথা ওরই তলায় চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে।

আমাদের কাছে সমস্ত ব্যাপারটা এখন পরিষ্কার হয়ে উঠলো। ডাইনীটা গোড়া থেকেই সমস্ত মতলব ভেঁজে রেখেছিল। হীরে দিয়ে খানাপিনার কথার ব্যঙ্গার্থটা এতক্ষণে বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠলো। হয়তো আমাদের আগে বেচারা বুড়ো সিল্‌ভেস্ত্রেকেও এমনি ভাবে কেউ বিপদে ফেলার চেষ্টা করেছিল; সে তা জানতে পেরেই বোধ হয় থলে ভর্তি হীরে-মাণিক ফেলেই এখান থেকে প্রাণ বাঁচিয়েছিল।

"এমনি করে নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকলে চলবে না," স্যার হেনরী ভারী গলায় বলে উঠলেন, "বাতিটা আর একটু বাদেই নিভে যাবে। তার আগে চলুন দেখি এই পাথুরে দরজার স্প্রীংটা খুঁজে পাই কি না।"

আমরা আকস্মিক বিপর্যয়ে দিশেহারা হয়ে দরজার ওপরে, নীচে ও

সুড়ঙ্গ পথের চারদিকের দেয়াল হাতড়ে হাতড়ে দেখতে লাগলাম। কিন্তু কোথাও স্প্রীং বা আংটা জাতীয় কিছু আবিষ্কার করতে পারলাম না।

"এটা নিশ্চিত যে," আমি বললাম, 'দরজাটা ভেতর থেকে খোলা বা বন্ধ করা যায় না। তা যদি যেতো, তা হলে গাগুল ওরকমভাবে মরিয়া হয়ে দরজার তলা দিয়ে গলে পালাবার চেষ্টা করতো না।"

স্যার হেনরী একটু শুকনো হেসে উত্তর দিলেন, "তা হলে দেখা যাচ্চে প্রতিশোধ ফলতে দেরী হলো না। গাগুলের মতই আমাদেরও শীগ্‌গিরই ভয়াল পরিসমাপ্তি ঘনিয়ে আসছে। দরজার ওপর মাথা কুটেও আর কোন ফল হবে না। চলুন রত্ন-কক্ষের দিকেই যাই।"

আমরা আবার রত্ন-কক্ষের দিকে পা বাড়ালাম। যাবার সময় সুড়ঙ্গ পথে অসমাপ্ত দেয়ালের কাছে ফৌলতার আনা খাবারের ঝুড়িটা পায়ে ঠেকলো। আমি সেটা কুড়িয়ে নিয়ে আমাদের ভবিষ্যতের সমাধি গহ্বর সেই অভিশপ্ত-কক্ষে ফিরে এলাম।

অমূল্য সম্পদ ভরা সিন্ধুকে পিঠ লাগিয়ে সবাই বসে আছি। স্যার হেনরী বললেন, "খাবারটা ভাগ করে ফেলা যাক্। যা খাবার আছে তাতে আমাদের যত দীর্ঘদিন চলে চালাতে হবে।"

আমরা তাঁর কথানুযায়ী খাবারটাকে ভাগ করে ফেল্‌লাম। খাবারের পরিমাণ এক এক ভাগে এতো কম দাঁড়ালো যে, তা খেয়ে একটা লোক কোন রকমে দুদিন বেঁচে থাকতে পারে। খাবারের মধ্যে ছিল শুক্‌নো মাংস আর দুটো লাউয়ের খোল ভর্তি জল।

"আজকের মতন এখন তো খাই দাই—কালকে মরলেও মরতে পারি", স্যার হেনরী বলে উঠলেন।

আমরা সবাই একটু করে শুকনো মাংস আর এক চুমুক করে জল খেলাম। যদিও আমাদের খাওয়ার দরকার ছিল, কিন্তু তেমন কিছুই

খেতে পারলাম না। তবে খাবারটা পেটে পড়বার পর অপেক্ষাকৃত সুস্থ বোধ হতে লাগলো। তারপর আমরা পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে কারা-কক্ষের দেয়াল, মেঝে সব পরীক্ষা করে দেখতে লাগলাম। সমস্ত ঘর কখনও ঠুকতে লাগলাম, কখনও বা হাতড়াতে লাগলাম—মনের মাঝে ক্ষীণ আশা, হয়তো বের হবার কোন একটা হদিস খুঁজে পাবো।

কিন্তু এতোটুকু চিহ্নও কিছু খুঁজে পাওয়া গেলো না। মনে হলো এই রত্ন-কক্ষে তা না পাওয়ার আশাই বেশী।

প্রদীপের আলো মৃদু থেকে মৃদুতর হয়ে আসতে লাগলো। বুঝলাম, তার তেল ফুরিয়ে এসেছে।

"কোয়াটার মেইন, কটা বাজলো ?"

আমি ঘড়িটা টেনে বার করলাম। তখন ছ'টা বাজে। যখন গুহায় ঢুকেছিল তখন দেখেছিলাম এগারোটা।

"আমাদের আজকে রাত্তে ফিরতে না দেখলে কাল সকালে ইন্‌ফাডুস্ নিশ্চয়ই খুঁজতে বেরুবে।" আমি মন্তব্য করলাম।

"হুঁ, তার খোঁজাই সার হবে।", স্যার হেনরী জবাব দিলেন, "এই দরজার গোপন রহস্য তো সে জানেই না, আর তা ছাড়াও বড় কথা হলো এই যে, এই দরজা কোথায় সে খোঁজটুকুও পর্যন্ত তার জানা নেই। আমাদের ভাগ্যে ভগবান ভরসা ছাড়া আর কিছু উপায় নেই বন্ধু! গুপ্তধনের সন্ধানে এসে অনেকেই প্রাণ হারিয়েছে, আমাদেরও তাদের দলেই যোগ দিতে হবে।"

প্রদীপের আলো আরও ক্ষীণ হয়ে এলো। এক সময় অকস্মাৎ প্রদীপটা দপ্ করে জ্বলে উঠে সমস্ত দৃশ্যটা উজ্জলতর করে তুল্‌লো, তারপর তার শিখাটা কঠিন নিকশ কালো আঁধারে ডুবে গেলো।

হেথায় বৃথা আশা

এরপর গুহার মধ্যে যে ভয়াল রাত্রি ঘনিয়ে এলো, তা, যথাযথ বর্ণনা করে বোঝানো আমার পক্ষে অসাধ্য। নিদ্রাদেবীর নিতান্ত দয়া বশতই আমাদের সে যন্ত্রণার খানিকটা উপশম হলো। কিন্তু আমার পক্ষে বেশী ঘুমানোও অসম্ভব হয়ে উঠলো। আমাদের অবশ্যম্ভাবী নিদারুণ মুহূর্তের কথা ছেড়ে দিলেও, গুহার মধ্যে বোবা কান্নাই যেন আমাদের গলা টিপে ধরলো। আমি তো আমি আমাদের আসন্ন ভাগ্যের কথা স্মরণ করলে অনেক চরম সাহসীর কলজে ও হিম হয়ে যেতো।

এমনি করে গুহার মধ্যে সে রাত্রির অবসান হলো।

"কোয়াটার মেইন," স্যার হেনরী জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার দেশলাইতে আর কটা কাঠি আছে?"

"আটটা,"

"একটা জ্বালাও, ঘড়িটা দেখা যাক।"

একটা কাঠি জ্বালান হলো। আমি ঘড়ি দেখলাম—পাঁচটা।

"কিছু খেয়ে নিয়ে শরীরটাকে খাড়া রাখলে হতো না?" আমি মন্তব্য করলাম।

আমার কথায় সকলেই কিছু মুখে দিয়ে নিলো। নিস্তব্ধভাবে কিছুক্ষণ সময় কেটে গেলে স্যার হেনরী পরামর্শ দিলেন যে, দরজার কাছে গিয়ে

চীৎকার করে ডাকতে, বাইরে থেকে যদি কেউ সাড়া দেয় এই আশায়। গুড্ হাতড়ে হাতড়ে সুড়ঙ্গ পথে এগিয়ে দরজার কাছে গিয়ে পৈশাচিক চীৎকার সুরু করে দিলো। কিন্তু সে-চীৎকার মশার গুন্‌গুনানির থেকে বেশী কার্যকরী হলো না।

খানিক বাদে গুড্ চুপ করে গেলো। ভয়ানক তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়েছিল সে, কাজেই এসেই খানিকটা জল খেয়ে ফেললো। এই চেঁচানীতে আমাদের জলের ভাণ্ডারের ওপর হাত পড়তে লাগলো দেখে, বাধ্য হয়েই তা থামিয়ে দিলাম।

আবার সেই হীরের সিন্ধুকে পিঠ দিয়ে বসলাম। কোন মূল্য নেই এই হীরের আর। এই কর্মহীন, স্তব্ধ মুহূর্তে এরা অতি তুচ্ছ। ভাগ্যের কি কঠিন পরিহাস। সত্যি বলতে কি আমার সমস্ত আশা নির্মূল হয়ে গেলো। আমি জীবনের আশা ছেড়ে দিয়ে স্যার হেনরীর পিঠে মুখ রেখে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলাম। মনে হলো অপর দিকে গুড্ও যেন তাঁর বুকে মুখ লুকিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে উঠছে।

সেই সাহসী মানুষটিকে কিন্তু অদ্ভুত লাগতে লাগলো। নিজের দুঃখের কথা ভুলে গিয়ে তিনি আপ্রাণ চেষ্টায় আমাদের সান্ত্বনা দিতে লাগলেন। বলতে লাগলেন সেই সব কাহিনীর কথা, যেখানে মানুষ এমনি বিপদে পড়েও দৈব বলে কেমন ভাবে রক্ষা পেয়ে গেছে। কিন্তু তাতেও যখন আমাদের মন কিছুমাত্র সান্ত্বনা পেলো না, তখন তিনি বোঝাতে লাগলেন যে, যার থেকে কোন মানুষেরই পরিত্রাণ নেই, সেই নিশ্চিত চরম মুহূর্তের জন্য ধীর ভাবে অপেক্ষা করাই কি ভালো না? মুহূর্তের মধ্যে সব দুঃখ শেষ হয়ে যাবে।

এমনিভাবে গতরাত্রের মত দিনটাও কোন রকমে কেটে গেলো। আর একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে ঘড়ি দেখলাম সাতটা বাজে।

আবার একবার খাওয়া দাওয়ার পালা শেষ করলাম। খেতে খেতে একটা কথা আমার মনে জাগলো।

"আচ্ছা, এখানকার বাতাস তাজা থাকছে কি করে?" আমি বলে উঠলাম।

"আরে তাইতো!" গুড্ লাফিয়ে উঠে বসলো. "এ কথা তো আমার একটুও মনে হয়নি। ঐ পাথুরে দরজাটাকে যদি যথার্থ দরজা বলাই হয়, তবে বলতেই হবে যে ওটার মধ্য দিয়ে বাতাস কখনই আসতে পারে না। কারণ, বাতাস আসবার পথ ও একেবারে মেরে রেখেছে। নিশ্চয়ই অন্য কোথা দিয়ে বাতাস আসছে। এখান দিয়ে যদি বাতাস চলাচল না করতো তবে এতক্ষণ আমরা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যেতাম। আসুন, ব্যাপারটা একটু তলিয়ে দেখা যাক।"

প্রায় ঘণ্টা দেড়েক ধরে আমরা হাতড়ালাম কিন্তু কোথাও কিছু পেলাম না। স্যার হেনরী আর আমি হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিলাম। কিন্তু গুড্ তবু আঁধারে হাতড়াতে লাগলো। একটু খুসীর সঙ্গেই সে বলতে লাগলো, "একেবারে বসে থাকার চেয়ে তবু কিছু করা ভাল।"

একটু পরেই সে উত্তেজিত ভাবে বলে উঠলো, "আসুন—আসুন, একবার এদিকে আসুনতো।"

আমরা তাড়াতাড়ি তার কাছে গিয়ে পড়লাম।

"মিঃ কোয়াটার মেইন, আমার হাতের কাছে আপনার হাতটা রাখুন তো! কি কিছু বুঝতে পারছেন?"

"মনে হচ্ছে বাতাস আসছে।"

"এইবার শুনুন তো।" বলে সে উঠে দাঁড়িয়ে পা দিয়ে সেই জায়গাটা ঠুকতে লাগলো। আমাদের মনে একটা ক্ষীণ আশা জেগে উঠলো। জায়গাটা থেকে ফাঁপা আওয়াজ কানে এসে লাগলো।

কাঁপতে কাঁপতে আমি একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বাললাম—মাত্র আর তিনটে অবশিষ্ট রইল। কাঠির স্বল্প আলোতে দেখতে পেলাম, আমরা সেই কক্ষটির এক কোণায় এসে পড়েছি। কাঠিটা পুড়তে পুড়তেই সমস্ত জায়গাটা আমরা খুঁটিয়ে দেখে নিলাম। সেই পাথুরে মেঝের ওপর খানিকটা জোড় খাওয়া জায়গা নজরে পড়লো। আর কি আশ্চর্য! দেখলাম যে, সেই মেঝের সঙ্গে এক হয়ে পড়ে আছে একটা পাথরের আংটা। আমাদের মুখ দিয়ে কারুর একটা কথাও বেরুলো না। কারণ আমরা এত উত্তেজিত হয়ে পড়লাম যে, বুকের মধ্যে হৃদপিণ্ডটা ধক্ ধক্ করতে লাগলো। কথা কইবার আর অবসরই পেলাম না। গুডের কাছে একটা ছুরি ছিল। তার পিছনের একটা বাঁকানো ফলা দিয়ে ঘোড়ার খুরে আট্‌কে যাওয়া পাথর তোলা হতো। সেইটে খুলে সে আংটাটার চারিদিক খোঁচাতে লাগলো। অবশেষে ফলাটাকে আংটাটার তলায় ঠেলে দিয়ে সে আস্তে আস্তে চাড় দিতে লাগলো। জোর দিতে পারে না, ভয়, যদি ফলাটা ভেঙে যায়। আংটাটা একটু করে নড়তে আরম্ভ করলো। পাথর বলেই সেটা এত দীর্ঘদিনেও সেঁটে যায় নি ; লোহা হলে কবে জঙ ধরে জমাট বেঁধে যেতো তার ঠিক নেই! গুড্ অতঃপর সেই আংটার মধ্যে হাত গলিয়ে দিয়ে প্রাণপণ শক্তিতে টান্‌তে লাগলো কিন্তু এতোটুকু আওয়াজ শোনা গেলো না।

আংটাটা ঘরের যে রকম কোণায় লাগানো ছিল, তাতে যদিও দু'জনের পক্ষে একসঙ্গে হাত লাগানো সম্ভব ছিল না, কিন্তু আমার আর সহ্য হচ্ছিল না, "দেখি আমি একবার," বলে আংটা ধরে সমস্ত শক্তি দিয়ে বারবার টান দিলাম কিন্তু কোন ফল হলো না শুধু হাঁফিয়ে উঠলাম।

এরপর স্যার হেনরীও চেষ্টা করে কিছু করতে পারলেন না। ফাটলের জোড়ের মুখে যেখান দিয়ে বাতাস আসছিল বলে মনে হয়েছিল, গুড্ ছুরির ফলাটা দিয়ে সেই জায়গাটা চাঁচ্তে লাগলো।

খানিকবাদে স্যার হেনরীকে সে বল্লো, "মিঃ কার্টিস্, আপনি আমাদের দুজনের সমান শক্তি রাখেন, আর একবার হাত লাগিয়ে দেখুন পারেন কিনা। দাঁড়ান দাঁড়ান—" এই বলে সে একটা কালো শক্ত সিল্কের রুমাল নিয়ে আংটার মধ্যে গলিয়ে দিলো। "মিঃ কোয়াটার মেইন, আমি যক্ষুনি বলবো, 'টানুন' তক্ষুনি আপনি স্যার হেনরীর কোমর ধরে আপ্রাণ শক্তিতে টানবেন।"

আমাদের সাথে সাথে স্যার হেনরী তাঁর সমস্ত শক্তি দিয়ে টান দিলেন,—আমি আর গুড্ও সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেহের সমস্ত জোর দিয়ে তাঁর শক্তিকে বাড়াতে লাগলাম।

"হেঁইয়ো! হেঁইয়ো! হয়েছে—আল্লা হয়েছে।" স্যার হেনরী হাঁফাতে লাগলেন। তাঁর পিঠের শক্ত পেশীগুলো কট্ কট্ করে উঠলো। তারপর হঠাৎ একটা কর্কশ ঘ্যাস্টানী আওয়াজ কানে এসে লাগলো—এক ঝলক বাতাস ভেসে এলো—একটা জগদ্দল পাথর বুকে রেখে মেঝের ওপর আমরা সবাই চীৎ হয়ে পড়লাম।

একটু দম নিয়ে উঠে বসতেই স্যার হেনরী বললেন, "খুব সাবধানে এবার একটা কাঠি জ্বালান মিঃ কোয়াটার মেইন্।"

তাঁর কথামত আমি একটা কাঠি জ্বালালাম। ভগবান তুমিই সত্য। সেই কাঠির ক্ষীণ আলোতে আমাদের সামনে এক পাথরের সিঁড়ির প্রথম ধাপটি ভেসে উঠলো।

গুড্ প্রশ্ন করে উঠলো, "আমরা কি করবো এখন?"

"ভাগ্যের ওপর নির্ভর করে সিঁড়ি ধরে নামবো।"

"দাঁড়ান—দাঁড়ান।" স্যার হেনরী বলে উঠলেন, "মিঃ কোয়াটার মেইন, আমাদের অবশিষ্ট খাবার ও জলের পাত্রটা সঙ্গে নিয়ে নিন, ওগুলো হয়তো ভবিষ্যতে আমাদের কাজে লাগতে পারে।"

আমি আবার গুঁড়ি মেরে সেই রত্ন-সিন্দুকের কাছে ফিরে এলাম। খাবার আর জল নিয়ে ফিরে আসার সময় আমার মাথায় এক মতলব এলো। একটু চিন্তা করলাম। এই নরকের মতন অন্ধকূপের ভিতর থেকে যদি আবার পৃথিবীর আলো দেখতে পাই তাহলে—তাহলে হয়তো এই বহুমূল্য পাথর আমাদের কাজে আসবে বলে মনে হলো। আমি কাল বিলম্ব না করে প্রথম সিন্দুকটার মধ্যে হাত ভরে দিলাম। আমার শিকারী-কোটের সমস্ত পকেটগুলো ভর্তি করে সঙ্গীদের উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে উঠলাম। "শুনছেন, আপনারা কিছু হীরে নিয়ে যাবেন না? আমি তো পকেট ভরে কিছু নিয়েছি।"

"ধ্যাৎত্তোর হীরের নিকুচি করেছে!" স্যার হেনরী অতি তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলে উঠলেন, "আর যেন আমাকে হীরে না দেখতে হয়।"

স্যার হেনরী সিঁড়ির প্রথম ধাপের ওপরই দাঁড়িয়ে ছিলেন, সেখান থেকেই হাঁক দিলেন, "চলে আসুন মিঃ কোয়াটার মেইন। সাবধান ঠিক আমার পিছনে পিছনে আসবেন আপনারা। হয়তো এই রকমই আর একটা ঘরও থাকতে পারে।" বলতে বলতে সিঁড়ি দিয়ে তিনি ধীরে ধীরে নামতে লাগলেন আর ধাপ গুনতে লাগলেন।

পনেরোটা সিঁড়ি পেরিয়ে এসে স্যার হেনরী থামলেন। "এই-খানেই সিঁড়ি শেষ। আমার মনে হচ্ছে কোনও গলি পথে আমরা এসেছি। আসুন নেমে আসুন।"

গুডের পিছনে পিছনে আমি সিঁড়ি থেকে নামলাম। তলায় পোঁছে দেশলাইয়ের অবশিষ্ট দুটো কাঠির একটা জ্বালালাম। কাঠির

অল্প আলোতে দেখতে পেলাম আমরা একটা সুড়ঙ্গ পথে দাঁড়িয়ে আছি। সেই পথ সিঁড়িটাকে সমকোণে রেখে বাঁ দিক থেকে ডান দিকে চলে গেছে। এর বেশী কিছু দেখবার আগেই কাঠির আলোটা আমার আঙ্গুলের ডগায় ছ্যাঁকা লাগিয়ে নিভে গেলো।

এখন সমস্যা হলো আমরা কোন পথে যাবো ? সমস্যার সমাধান করতে আমরা যেন হিম্‌সিম্‌ খেয়ে উঠলাম। হঠাৎ গুডের মাথায় এলো যে, আমি যখন কাঠিটা জ্বালাই তখন বাতাসে শিখাটা সে বাঁ-দিকে হেলতে দেখেছে। তাই সে বলে উঠলো, "দেখুন, বাতাস আসবার সময়, বাইরের দিক থেকে ভিতর পানেই আসে। তার টানটা থাকে ভিতরে দিকে, বাইরের দিকে নয় ; কাজেই চলুন আমরা বাতাসের বিপরীত গতির দিকেই চলি।"

আমরা গুডের পরামর্শই মেনে নিলাম। একদিকে দেয়াল হাতড়াতে হাতড়াতে আর অন্যদিকে পা ঘষতে ঘষতে বাঁচবার আশায় আমরা সেই অভিশপ্ত রত্ন-কক্ষ ছেড়ে এগিয়ে চল্‌লাম।

হাতড়ে হাতড়ে প্রায় পোয়াঘণ্টা চলবার পর, সুড়ঙ্গ পথটা ফট্‌ করে একটা বাঁক নিলো। মনে হলো যেন অন্য আর একটা পথ এসে এই পথটাকে খণ্ডিত করে গেছে। আমরা এই পথে চলতে চলতে দুটো বাঁক পেরিয়ে আর একটা নতুন বাঁকের মুখে এসে পড়লাম। সুড়ঙ্গ পথের যেন আর শেষ নেই। চলেছি তো চলেছিই। মনে হলো আমরা যেন একটা অন্তহীন গোলক ধাঁধায় ঘুরে মরছি।

ক্লান্তিতে অবশেষে এগিয়ে চলা অসম্ভব হয়ে পড়লো। দেহের ও মনের দিক থেকে অত্যন্ত শ্রান্ত হয়ে বসে পড়লাম। যে চিন্তায় মানুষের বুক শুকিয়ে যায়, নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে, তাকে শুধু কোনরকমে দূরে সরিয়ে রেখে আমরা একটু শুকনো মাংস মুখে দিলাম আর তারি

সঙ্গে জলের সম্বলটুকু এক নিঃশ্বাসে শেষ করে ফেললাম। আমাদের গলা তখন শুকিয়ে যে রকম কাঠ হয়ে উঠেছিল, তাতে সঙ্গের জলের ঐ গতি করা ছাড়া আর আমাদের উপায়ও ছিল না।

সমস্ত আশা ছেড়ে দিয়ে আমি গুম্ হয়ে বসে ছিলাম। হঠাৎ একটা আওয়াজ আমার কানে এলো। আমি সেদিকে সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করলাম। অনেক দূর থেকে, অতি ক্ষীণ হলেও একটা শব্দ ঠিক ভেসে আসছিল—একটা ক্ষীণ মর্মর ধ্বনি, শুধু আমি নয় সকলেই পাচ্ছিল।

"হায় ভগবান! এ-তো জলস্রোতের আওয়াজ বলে মনে হচ্ছে," গুড্ বলে উঠলো, "চলুন—চলুন এগুনো যাক্।"

আমরা শব্দ লক্ষ্য করে আবার পাথুরে দেয়াল হাতড়ে হাতড়ে চল্‌তে লাগলাম। এবার এগিয়ে চলার সাথে সাথে জলের আওয়াজ ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগলো। সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে জল-কল্লোল অবশেষে আরও সুস্পষ্ট ও গভীর হয়ে উঠলো। গুড্ এগিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল, সে বলে উঠলো, "জলের গন্ধ পাচ্ছি।"

"গুড্ একটু আস্তে চলো," স্যার হেনরী সাবধান করতে লাগলেন "আমাদের একসঙ্গে কাছাকাছি থাকাই ভালো।"

স্যার হেনরীর সাবধান বাণী শেষ হবার আগেই 'ঝপাৎ' করে একটা শব্দ হলো আর তার সাথেই গুডের আর্ত চীৎকার শোনা গেলো।

"গুড্! গুড্!" করে আমরাও চেঁচিয়ে উঠলাম, গুড্ কোথায় তুমি, সাড়া দাও—সাড়া দাও।"

জলের মধ্য থেকে গুডের সাড়া পেয়ে আশ্বস্ত হলাম।

"ভয় নেই ঠিক আছি। তবে উপস্থিত একটা পাথর আঁকড়ে ভাসছি। একটা কাঠি জ্বালান আপনারা কোথায় একবার দেখেনিই।"

তাড়াতাড়ি আমি অবশিষ্ট কাঠিটা জ্বালালাম। কাঠির সেই ক্ষীণ আলোতে আবিষ্কার করলাম আমাদের পায়ের কাছে একটা কালো জলের স্রোত বয়ে চলেছে। জল-ধারাটা যে কত চওড়া তা ঠাওর করতে পারলাম না, তবে আমাদের সঙ্গীটির কালো মূর্তি তীরের কাছেই একটা পাহাড়ের ডালে গা বেয়ে ঝুলছে দেখলাম।

গুড্ চেঁচিয়ে বলে উঠলো, "আমাকে টেনে তোলার জন্যে শক্ত হয়ে দাঁড়ান ; সাঁতার কেটে আমায় ধারে পৌঁছোতে হবে।"

ছপ্ ছপ্ করে অতি কষ্টে জল কেটে আসার শব্দ কাণে এলো। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই গুড্ স্যার হেনরীর প্রসারিত হাতটা ধরে ফেল্লো। তারপর দুজনে মিলে তাকে টেনে হিঁচড়ে ডাঙায় তুললাম।

এই অন্তঃসলিলা নদীর পাড় ধরে আর আমাদের যেতে সাহস হলো না। কি জানি কখন অন্ধকারে পা ফস্কে জলে পড়ি। গুড্ একটু সামলে উঠলে আমরা প্রাণ ভরে জল খেলাম। জল খারাপ লাগলো না। সেই জলেই হাত মুখ ধুয়ে আমরা সবাই সুস্থ হলাম।

মুখে-চোখে জল দেবার কত প্রয়োজন ছিল এইবার বুঝতে পারলাম। খানিকটা পরে সেই নরকের নদী ছেড়ে আমরা আবার যে দিক থেকে এসেছিলাম সেই দিকেই ফিরে চল্লাম। ভিজে কাপড়ে চলতে বেচারা গুডের বড় কষ্ট হতে লাগলো। হাঁটতে হাঁটতে অবশেষে আমরা ডান দিকে আরেকটা সুড়ঙ্গ পথে এসে পড়লাম।

স্যার হেনরী ক্লান্তভাবে বলে উঠলেন, "সব পথই এখানে যখন সমান, তখন এপথে চলতেই বা আমাদের আপত্তি কি! চলতে চলতেই আমাদের শেষ হতে হবে।"

আমরা খুব ধীরে ধীরে এগিয়ে চলতে লাগলাম। ক্লান্তিতে সমস্ত দেহ অবশ হয়ে গেছে আমাদের ; পা আর চলে না। স্যার হেনরী আগে

চলেছেন তাঁর পিছনে আমরা। হঠাৎ তিনি থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন। তাঁর গায়ে ধাক্কা খেয়ে আমাদের চলাও থেমে গেলো।

"দেখুন—দেখুন," স্যার হেনরী বলে উঠলেন, "আমার মাথা কি খারাপ হয়ে গেলো না সত্যিই আমি সামনে আলো দেখতে পাচ্ছি ?"

আমরা দু' জনে বিস্ফারিত চোখে সেই দিকে তাকালাম। দেখলাম সত্যিই বহুদূরে একটা আলোর ঝাপ্সা আভা দেখা যাচ্ছে।

আশায় উত্তেজিত হয়ে সেই দিকে আমরা দৌড় দিলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের সমস্ত সন্দেহ দূর হয়ে গেলো। সত্যিকারের মুক্ত বাতাস আমাদের চোখে মুখে এসে লাগতে লাগলো। ওটা যে আলো সে বিষয়ে আমাদের আর এতটুকুও সন্দেহ রইলো না। তবুও আমরা ছুটতে লাগলাম। হঠাৎ সুড়ঙ্গ পথটা সরু হয়ে আসতে লাগলো। স্যার হেনরী হাঁটু মুড়ে চলতে লাগলেন। কিন্তু তাতেও কুলালো না সুড়ঙ্গের পরিসর আগেকার চেয়ে আরও কমতে লাগলো। কমতে কমতে পথটা শেষে একটা শিয়ালের গর্তের মাপে এসে দাঁড়ালো। মাটি—পায়ের তলায় মাটি—পাহাড় শেষ হয়ে গেছে। সবার আগে স্যার হেনরী গুটিসুটি মেরে ঝটাপটি করে কোন রকমে গর্ত দিয়ে গলে বেরুলেন। তারপর গুড্ তারপর আমি। আঃ—নাকের মধ্যে মিষ্টি বাতাসের আভাস লাগলো! মাথার ওপর তারার জল্জলে আলো আশীর্ব্বাদের মত ঝরে পড়লো। হঠাৎ আমাদের পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেলো। আমরা গড়্গড়িয়ে গড়াতে লাগলাম। গড়াতে গড়াতে কিসে যেন আমার দেহটা আট্কে গেলো। আমি উঠে বসে সঙ্গীদের নাম ধরে হাঁক পাড়তে লাগলাম। একটু বাদেই আমার ঠিক নীচে থেকে স্যার হেনরীর উত্তর পেলাম। একটা সমতল ভূমিতে পড়ে তাঁর দুর্বার গতি রুদ্ধ হয়ে গেছে। কোন রকমে হামাগুড়ি দিয়ে আমি

কাছে পৌঁছে তাঁকে সুস্থ দেখে নিশ্চিন্ত হলাম। খানিক দূরে গুড্‌কেও খুঁজে পাওয়া গেলো। দেখে বুঝলাম বেশ জখম হয়েছে গুড্। তবুও খানিক বাদে সে নিজেই চাঙ্গা হয়ে উঠে বসলো। আমরা সবাই মিলে ঘাসের ওপর বসলাম। আসন্ন মৃত্যুর গহ্বর থেকে আমরা জীবন্ত বেরিয়ে আসতে পেরেছি এর চেয়ে বড় কথা আর কি হতে পারে। নিশ্চয়ই কোন অদৃশ্য শক্তি আমাদের এই পর্যন্ত চালিয়ে নিয়ে এসেছে। এই নতুন অবস্থায় আমাদের মনে এমন ভাব জাগলো যে আমরা আনন্দে প্রায় চীৎকার করতে লাগলাম।

ধীরে ধীরে উষার ধূসর আলো পাহাড়ের ঢালু গা বেয়ে নেমে এলো। সেই আলোতে দেখতে পেলাম, আমরা যে গুহাতে প্রথম প্রবেশ করেছিলাম তারই সামনে এক বিরাট খাদের মধ্যে পড়ে আছি। একটু একটু করে বহু ওপরে গুহার প্রবেশ দ্বারে ত্রিমূর্তির আকৃতি গুলো স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগলো।

ক্রমে ফর্সা হয়ে এলো। আমাদের চেহারা গুলো দিনের আলোতে স্পষ্ট হয়ে উঠলো। কিন্তু সে যা চেহারা দেখলাম আজও ভুলতে পারিনি। সমস্ত হাড় বেরিয়ে পড়েছে, গাল বসে গেছে, চোখ গর্তে ঢুকে গেছে। সমস্ত গায়ে ধূলো মাখা। ক্ষত দিয়ে রক্ত ঝরছে। চোখে মুখে তখনও আসন্ন মৃত্যুর ছাপ মুছে যায় নি। সেই চেহারা দেখে দিনের আলোয় লোকে আঁৎকে উঠতো।

বেশীক্ষণ ঐ অবস্থায় বসে থাকলে আমাদের হাত পা গুলো সব জমে যাবে বলে মনে হতে লাগলো। কাজেই আমরা ওপরে ওঠার চেষ্টা করতে লাগলাম। কখনও গাছের শিকড় ধরে, কখনও ঘাসের গুছি ধরে সেই নীল পাথরের খাড়াই বেয়ে আমরা অতি কষ্টে ওপরে গিয়ে সলোমনের রাজপথে উঠলাম।

পথের ধারে প্রায় একশো গজ দূরে কয়েকটা কুঁড়ের সামনে আগুন জ্বেলে কতকগুলো লোক আগুন পোয়াচ্ছে দেখতে পেলাম। আমরা কোনরকমে টলতে টলতে সেই দিকে এগুতে লাগলাম। আমাদের চলবার আর শক্তি ছিল না; তবু কোন রকমে তিনজনে ধরাধরি করে এগুচ্ছিলাম। একটা লোক আমাদের দেখতে পেয়ে উঠে এলো। তারপর মাটিতে পড়ে ভয়ে চীৎকার করতে লাগলো।

"ইন্‌ফাডুস্, ইন্‌ফাডুস্—আমরা, আমরা—তোমাদের বন্ধু-"

ইন্‌ফাডুস্ উঠে বসলো। তারপর দৌড়ে এসে আমাদের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলো। ভয়ে তখনও তার সর্ব শরীর ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে।

"হুজুর—প্রভু! আপনারা এসেছেন! যমের দুয়ার থেকে আপনারা ফিরে এসেছেন?" সে অভিভূতের মত বলতে লাগলো। তারপর সেই বৃদ্ধ সৈনিক আমাদের সামনে উবুড় হয়ে পড়ে স্যার হেনরীর হাঁটু ধরে আনন্দে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলো।

ইগ্‌নোসীর কাছে বিদায়

গুহায় প্রবেশ করার দশদিন পরে আবার আমরা আমাদের সেই 'লু'র পুরোনো আস্তানায় ফিরে এলাম।

সলোমনের রত্ন-কক্ষে আমরা যে আর ফিরে যাইনি সে কথা বোধ করি না বললেও চলবে। তবে সুস্থ হয়ে, যে পথ দিয়ে আমরা বেরিয়ে এসেছিলাম সেই পথের খোঁজে খাদে একবার নেমেছিলাম, কিন্তু তার চিহ্ন পর্যন্তও কোথাও আর খুঁজে পাইনি।

'লু'তে পেঁছুবা মাত্র ইগ্‌নোসি আমাদের একেবারে যেন লুফে নিলো। আমাদের কথা সে হাঁ করে শুনতে লাগলো। একের পর এক আমাদের বিচিত্র অভিজ্ঞতা শোনবার পর ইগ্‌নোসির কাছে আমরা ফিরে যাবার কথা পাড়লাম।

কথা শুনে ইগ্‌নোসি দু'হাতে মুখ ঢাক্‌লো। তারপর খানিক চুপ করে থেকে জবাব দিলো, "আপনাদের কথা শুনে মনে হচ্ছে, আমার বুকটা যেন দু' আধখানা করে কে ভেঙ্গে দিয়ে গেলো। ইন্‌কুবু, মাকুমাজাহন্, বাউগয়ান আমি কি করেছি যে আপনারা আমাকে ছেড়ে যাবেন ?"

"না-না তার জন্যে নয়—তার জন্যে নয়।" আমি উত্তর করলাম, আমাদের নিজেদের আরও কাজকর্ম আছে তো।"

"ও এতক্ষণে বুঝেছি," ইগ্‌নোসির চোখ দুটো জ্বলে উঠলো, "আপনারা আমাকে ভালোবাসেন না, বন্ধুভাবে চান না, ভালোবাসেন খালি ঐ রঙচঙা পাথর গুলোকে।"

আমি তার গায়ে হাত দিয়ে বললাম, "আচ্ছা ইগ্‌নোসি, সত্যিকরে বলো দিকিনি, তুমি একদিন যখন জুলুদের দেশে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে তখন তোমার মায়ের কাছে শোনা মাতৃভূমির জন্যে, আপনার জনের জন্যে প্রাণ কাঁদতো কি না ?"

"কাঁদতো মাকুমাজাহন্ !"

"ঠিক তোমার মতই আমাদের মনও আপন জনের জন্যে যে আকুল হয়ে পড়েছে ইগ্‌নোসি।"

ইগ্‌নোসি চুপ করে গেলো। যখন স্তব্ধতা ভঙ্গ করলো তখন তার স্বর অন্য রকম হয়ে গেছে।

"বুঝেছি মাকুমাজাহন্। আপনার যুক্তিকে না করতে পারি না। তবে তাই হবে। আপনারা চলে যাবেন বটে, কিন্তু আমার মনে কি ব্যথা রয়ে যাবে তা আপনারা বুঝতে পারবেন না। কারণ আপনারা যে দেশে চলে যাবেন, সেখান থেকে তো কোনদিন আপনাদের খবর কেউ নিয়ে আসবে না। আমা র কাছে তখন যে আপনারা মৃতের দেশের মানুষ হয়ে যাবেন।

"যাক, তাই হবে ; কাল আমার খুড়ো ইন্‌ফাডুস্ এক সৈন্য বাহিনী নিয়ে আপনাদের পথ দেখিয়ে এগিয়ে নিয়ে আসবে। আমি শুনেছি সহজ পথে পাহাড় পেরিয়ে যাবার আর এক রাস্তা আছে। আপনারা সেই পথেই যাবেন। তবে বিদায় ভাই সব।"

পরদিন সকালে আমরা 'লু'থেকে যাত্রা করলাম। আমাদের এগিয়ে দেবার জন্য ইন্‌ফাডুস্ তার বীর-সৈন্যদল নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে

চললো। সলোমনের রাজপথের উত্তর দিক ধরে আমরা চলতে লাগলাম। কুকুয়ানাদের দেশ থেকে বাইরের পৃথিবীতে যাবার এইটাই সহজ আর নিরাপদ পথ। একটা গিরি-পথ ধরে চার দিন চলার পর, রাত্রিবেলা পাহাড়ের শেষ সীমানায় এসে পেঁছিলাম। এখান থেকেই মরুভূমি সুরু।

ওপর থেকে দেখতে পেলাম, পাহাড়ের তলদেশ সেই বিরাট বালির সমুদ্রের মধ্যে গড়াতে গড়াতে কোথায় তলিয়ে গেছে তার ঠিক নেই।

এইবার আমাদের বন্ধু আর সত্যিকারের বীর ইন্‌ফাডুস্‌কে বিদায় দিতে হলো। বেচারা কেঁদে ফেললো! ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলতে লাগলো, "আপনাদের সঙ্গে আর কখনও আমাদের দেখা হবে না সত্যি, কিন্তু জীবনে আপনাদের কথা বুড়ো ইন্‌ফাডুস্‌ ভুলবে না।"

ইন্‌ফাডুস্‌কে বিদায় দিতে আমাদেরও কষ্ট হচ্ছিল! গুড্‌ এত অভিভূত হয়ে পড়েছিল যে, তাকে স্মারক চিহ্ন হিসাবে তার চশমার কাঁচটাই উপহার দিয়ে ফেল্‌লো। উপহার পেয়ে ইন্‌ফাডুস্‌ও বেশ খুসী হয়ে উঠলো। কারণ এইরকম উপহারের অধিকারী হওয়ার মানে দেশের লোকের কাছে তার মান আরও বেড়ে যাবে। অনেকবার চেষ্টা করে অবশেষে সে একচোখে কাঁচটা লাগিয়ে আমাদের দিকে হাসি মুখে ফিরে তাকালো।

ইন্‌ফাডুসের সৈন্যেরা 'কুম' গর্জনে আমাদের বিদায় অভিনন্দন জানালো। আমরা ইন্‌ফাডুসের দুই হাত মুঠোর মধ্যে ধরে প্রীতি জানিয়ে নিচে নামবার পথ ধরলাম। আমাদের সঙ্গে জল আর খাবার নিয়ে গাইড্‌ হিসাবে কয়েকজন সৈনিক সঙ্গে সঙ্গে চললো।

সেই খাড়াই ফাটলের ধার বেয়ে নিচে নামা প্রতি পদে পদে বেশ কষ্টকর হয়ে উঠতে লাগলো। কিন্তু সৌভাগ্য বশত ভালোয় ভালোয়

সন্ধ্যার দিকে আমরা পাহাড়ের তলায় এসে পৌঁছুলাম। রাতের মতন সেইখানেই আমরা ক্যাম্প ফেললাম। আগুনের আলোয় মাথার ওপর ঝুঁকে পড়া পাহাড়ের চূড়োগুলোর দিকে তাকিয়ে বাড়ীর জন্য আমাদের সকলেরই মন ভারী হয়ে উঠলো।

সকালের দিকে আমাদের মরুপথ পাড়ি দেওয়া সুরু হলো। আবার সেই অসহ্য ক্লান্তিকর একটানা পথ চলা। তবে ভরসা এই যে সঙ্গে প্রচুর জল আছে। তৃতীয় দিন দুপুরের দিকে মরুভূমির মাঝে দূরে একটা-একটা গাছ চোখে পড়তে লাগলো। আমাদের সঙ্গের লোকেরা বললো আমরা মরুদ্যানের কাছাকাছি এসে গেছি। বিকেলের দিকে সূর্যাস্তের ঘণ্টাখানেকের মধ্যে সত্যিই নরম ঘাসের মোলায়েম পরশ আমাদের পাগুলোতে যেন হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো। জলের কুলু কুলু শব্দ শুনে প্রাণ জুড়িয়ে গেলো।

পুনর্মিলন

আমাদের বৈচিত্রপূর্ণ অভিজ্ঞতার সবচেয়ে রহস্যময় ঘটনা কেমন করে এই মরুভূমির মাঝখানে অপ্রত্যাশিতভাবে ঘটে গেলো, তা এইবার আমি পাঠকদের কাছে বলবো।

মরুদ্বীপের নদীর ধার দিয়ে একলা বেড়াচ্ছি। এমন সময় দূরে একটা জিনিস দেখে আমি থমকে দাঁড়ালাম। দেখি, আমার কাছ থেকে প্রায় বিশগজ দূরে, একটা ডুমুর গাছের তলায় কাফির ধরণে, খড়ে ছাওয়া এক সুন্দর কুটীর। তার প্রশস্ত দরজাটাও দূর থেকে স্পষ্ট চোখে পড়ছে।

এখানে কোথা থেকে কুটীর এলো আমি ভেবে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম। দেখতে দেখতে কুটীরের দরজাটা খুলে গেলো, আর ঘর থেকে খোঁড়াতে খোঁড়াতে বেরিয়ে এলো একটা সাদামানুষ। গায়ে তার চামড়ার পোষাক আর মুখে একগাল কালো দাড়ি। আমিও তার দিকে হাঁ ক'রে তাকিয়ে রইলাম। সেও আমার দিকে বিস্ফারিত চোখে চেয়ে দেখতে লাগলো। ঠিক এই সময়ে স্যার হেনরী আর গুড্ এসে উপস্থিত হলেন।

স্যার হেনরী আর গুড্ দুজনেই সেদিকে দেখতে লাগলেন। দেখতে দেখতে লোকটা একটা চীৎকার দিয়ে আমাদের দিকে থপ্ থপ্ করে খোঁড়া পায়ে লাফিয়ে লাফিয়ে আসতে লাগলো। কাছে এসে আর দাঁড়াতে পারলো না। অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলো।

"জয় ভগবান!" হারিয়ে যাওয়া আপন জনকে অনেক দিন পরে

আকস্মাৎ ফিরে পেয়ে বিস্ময়ে, আনন্দে, স্থার হেনরী চীৎকার করে উঠলেন, "এই তো আমার ভাই—জর্জ !"

গোলমাল শুনে ইতোমধ্যে ঘর থেকে বন্দুক হাতে আর একজন লোক দৌড়ে বেরিয়ে এলো। কাছে এসে আমাকে দেখতে পেয়ে সেই লোকটাও একটা চীৎকার দিয়ে বলে, উঠলো, "মাকুমাজাহন্ আমাকে চিন্তে পারছেন না, আমি শিকারী জিম্। আমার প্রভুর হাতে দেবার জন্যে যে চিঠিটা দিয়েছিলেন আমি সেটা হারিয়ে ফেলি। আজ প্রায় দু'বছর হলো এখানে এমনি ভাবে পড়ে আছি।" লোকটা আমার পায়ের ওপর পড়ে আনন্দে কেঁদেই ফেললো।

"আমি তো তখনই সাবধান করে দিয়েছিলাম রে হতভাগা!" আমি তাকে সান্ত্বনার সুরে বল্লাম।

এরমধ্যে কালো দাড়িওয়ালা ভদ্রলোকটি জ্ঞান পেয়ে উঠে বসেছিলেন। স্থার হেনরী আর তিনি, দু'জনে দু'জনের হাতের ওপর হাত বোলাচ্ছিলেন। কারু মুখে কোন কথা ছিল না। অতীত কলহের গ্লানি তাঁদের মধ্যে আর বর্তমান আছে বলে মনে হলো না।

স্থার হেনরী অবশেষে জলভরা চোখে বললেন, "ভাই, তোকে যে জীবিত দেখতে পাবো এ আশা আমি একরকম ছেড়েই দিয়েছিলাম। তোকে খোঁজবার জন্য কোথায় সেই সলোমন পাহাড় পেরিয়ে গিয়েছি, কত বিপদ বরণ করেছি, তবু তোর খোঁজ পাইনি। আর আজ কিনা তোকে এই শুকনো মরুভূমির মাঝে এমনি করে পেলুম।"

"বছর দুই আগে," জর্জ বলতে লাগলো, "আমিও সলোমন পাহাড়ে যেতে চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু এই জায়গায় এসে একটা পাথর পড়ে আমার পা'টা গুঁড়িয়ে যায়, সেই থেকেই এখানে পড়ে আছি। কোন দিকে এক পা-ও নড়তে পারিনি।"

রাত্রির বেলা আমাদের ক্যাম্পের আগুনের ধারে বসে জর্জ তার কাহিনী শোনাতে লাগলো। সে কাহিনী সংক্ষেপে আমি বলে যাচ্ছি। দু'বছর আগে, জর্জ, জিম্‌কে সঙ্গে নিয়ে সিতান্দা থেকে সলোমন পাহাড়ের দিকে যাত্রা করে। আমার দেওয়া চিঠি ও নক্সা তার হাতে পৌঁছোয় নি। এ সম্বন্ধে সে কিছুই জানতো না। এই প্রথম শুনলো। যাই হোক দিশী লোকদের কাছে শুনে শুনে সে এই পথে আসতে থাকে। অনেক কষ্টে তারা এই মরুদ্যানে এসে পৌঁছোয়। যে দিন তারা এখানে পৌঁছোয় সেদিনই নদীর ধারে এক জায়গায় জর্জ বসে ছিল আর জিম্ কাছেই একটা পাহাড়ী ঢিবির ওপর এক ধরণের হুল-বিহীন মৌমাছির মৌচাক ভাঙছিল। হঠাৎ একটা ভারী পাথর, ঢিবি থেকে গড়িয়ে এসে সজোরে তার ডান পায়ের ওপর প'ড়ে সঙ্গে সঙ্গে পা'টা সাংঘাতিক ভাবে জখম করে দেয়। সেই থেকে সে চলচ্ছক্তিহীন হয়ে এখানে পড়ে আছে আর মরবার জন্যে দিন গুনছে।

এখানে খাবার অসুবিধা নেই। শিকার করা প্রাণীর মাংস তারা খায় আর তারই ছাল-চামড়ায় তারা জামা কাপড় ক'রে পরে। এমনি করে দিন কাটাচ্ছিল। অবশেষে তারা ঠিক করে যে, জিম্ আগামী কাল সিতান্দায় ফিরে যাবে। গিয়ে সেখান থেকে লোকজন নিয়ে এসে জর্জকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবে। জর্জ বলতে লাগলো, অবিশ্যি জিম্ যে ফিরে আসবে সে আশা তার ছিল না তবে একবার শেষ চেষ্টা করে দেখা। ইতোমধ্যে ভগবানের আশীর্বাদের মত আমরা এসে হাজির হলাম।

তারপর স্যার হেনরী অনেক রাত ধরে আমাদের বিচিত্র অভিজ্ঞতা আর এ্যাড্‌ভেন্‌চারের কথা মোটামুটি তাকে শোনালেন।

আমি যখন অবশিষ্ট কয়েকটা হীরের টুকরো বের করে দেখালাম তখন সে অবাক হয়ে বলে উঠলো, "আরি ব্যস্! তাহলে আপনাদের কষ্ট করা সার্থক হয়েছে বলুন। অন্তত কিছু পেয়েছেন, আমার মতন একেবারে হতভাগা নন্।"

স্যার হেনরী তাঁর কথা শুনে হো-হো করে হেসে উঠলেন, বল্লেন, "হীরে যা পাওয়া গেছে সর্ত অনুযায়ী তা সব কোয়াটার মেইন আর গুডের।"

তাঁর কথায় আমার মনে একটা চিন্তার উদয় হলো। গুডের সঙ্গে পরামর্শ করে আমি স্যার হেনরীকে বল্লাম যে আমার কাছে যা হীরে আছে তার একতৃতীয়াংশ তাঁকে নিতে হবে, তিনি যদি না নেন তবে তাঁর অংশ তাঁর ভাইয়ের হাতে দিতে অনুমতি দেওয়া হোক্। স্যার হেনরী কিছুতেই এ প্রস্তাবে রাজী হবেন না। যা হোক অনেক কষ্টে একরকম জোর করেই আমাদের প্রস্তাবে তাঁকে শেষ পর্যন্ত রাজী করলাম।

আমার জীবনের সেই বৈচিত্র্যপূর্ণ ইতিহাস প্রায় শেষ করে এনেছি। এর শেষটুকু না বললে কাহিনী অসম্পূর্ণ থেকে যাবে বলেই সংক্ষেপে সেটা শেষ করছি। জর্জকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের মরুভূমি পেরিয়ে আসতে বেশ কষ্ট পেতে হলো। ছ'মাস পরে আবার সিতান্দায় ফিরে এলাম। আমাদের সুস্থ শরীরে ফিরে আসতে দেখে সকলেই বেশ অবাক হয়ে গেলো। এখানে যে লোকটার জিম্মায় আমাদের বন্দুক ও অন্যান্য জিনিসপত্তর সব রেখে গিয়েছিলাম, সে লোকটা আমাদের দেখে বেশ অসন্তুষ্টই হলো। স্বপ্নেও বেচারা ভাবেনি যে, আমরা ফিরে এসে আবার এ সব দাবী করবো। ডারবানের কাছে এসে আমার এই দীর্ঘ আর বিচিত্র অভিযানের সাথীদের বিদায় দিলাম।